Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহমিদা সুলতানা নাদিয়া

রোলঃ 23090120406

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহমিদা সুলতানা নাদিয়া

রোলঃ 23090120406

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাহমিদা সুলতানা নাদিয়া, আইডিঃ 23090120406 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফাহমিদা সুলতানা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

ফাহমিদা সুলতানা নাদিয়া

আইডিঃ 23090120406

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা: 5
নাফস কি: 6
কুরাআনের আলোকে আত্মশুদ্ধি: 9
হাদিসের আলোকে আত্মশুদ্ধি: 13
তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির পরিচয়: 17
আত্মশুদ্ধিই সফলতার মূল: 19
আত্মশুদ্ধি অর্জনের পথে বাধা: 20
তাওহীদ আত্মশুদ্ধির প্রধান হাতিয়ার: 41
আত্মশুদ্ধি অর্জনে সালাতের ভূমিকা: 44
আত্মশুদ্ধি অর্জনে যাকাতের ভূমিকা: 47
দোআ আত্মশুদ্ধির চাবিকাঠি: 50
কুরআনুল কারীম আত্মশুদ্ধির বিশাল পাথেয়: 53
উপসংহার: 55

ভূমিকা:

সকল প্রশংসা আল্লহ'র ﷻ জন্য। সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও শেষ রাসূল, আল্লাহর প্রিয় হাবিব, আমাদের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ, চক্ষু শীতলকারী ও বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর উপর অজস্র দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। সেই সাথে তাঁর পরিবারবর্গ, তার প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম(রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা সত্য দ্বীন ইসলামের পথে চলবে তাদের সকলের ওপরই দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

নাফসের পরিশুদ্ধি দ্বীনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নাফস পরিশুদ্ধ হওয়া ছাড়া মানুষের ঈমান ও ইখলাস কখনো পরিপূর্ণ হয় না। প্রতিটি মানুষের দুটি দিক আছে। একটি হলো বাহ্যিক আরেকটি হলো অভ্যন্তরীণ। ইসলাম যেমন মানুষের বাহ্যিক দিককে পূত-পবিত্র করতে চায় তেমনি করে অভ্যন্তরীণ দিকটিকেও সমপূর্ন কলোষমুক্ত ও সুন্দর করতে চায়। মানুষের এ অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ আত্মিক দিকটির পরিশুদ্ধিকেই কোরআনের ভাষায় 'তাযকিয়া' বলা হয়।যদি কেউ বাহ্যিক ও প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সালাত, সাওম, যাকাত ও হাজ্জ পালন করে; কিন্তু তার নাফস পবিত্র ও পরিশুদ্ধ না হয়, তা হলে তার সে 'আমাল ঐ ফুলের মতো, যার রং সুন্দর ও আকর্ষণীয়; কিন্তু তাতে কোনো সুঘ্রাণ নেই।' ইসলামের দৃষ্টিতে যদি কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষা করতে হয়, তা হলে অবশ্যই দেখতে হবে যে, তার অন্তর কতোখানি পবিত্র ও কলুষমুক্ত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার অন্তরকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাই যার অন্তর যত বেশি পবিত্র ও কলুষমুক্ত সেই আল্লাহর ততো বেশি নিকটবর্তী।

নাফস কি:

নাফসকে সংশোধন করতে হলে অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হলে আমাদের সর্বপ্রথম নাফস সম্পর্কে জানতে হবে।নিম্নে নাফস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:-

নাফস বলা হয় মানুষের কামনা বাসনা চাহিদা ইত্যাদি কে। এক কথায় যাকে বলা হয় প্রভৃতি। আল্লাহ তাআলা মানুষের সৃষ্টির সময় তার স্বভাবে কতিপয় চাহিদা দান করেছে। যেমন: আহারের চাহিদা, যৌবনের চাহিদা, ক্ষমতার চাহিদা, কর্তৃত্বের চাহিদা, লোভ লালসা ইত্যাদি। সব গুলোকে এক কথায় জৈবিক চাহিদা বলে। আর আর এগুলোই হল নাফস বা প্রবৃত্তি।

নাফস তার বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আবার তিন প্রকার। মূলত নাফস একটি কিন্তু কাল পরিক্রমায় স্বভাবের তাড়নায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। তাই বলা যায়- অবস্থানের দিক দিয়ে নাফস তিন প্রকার।

১.নফসে আম্মারাহ
২.নফসে লাওয়্যামাহ
৩.নফসে মুত্বমায়িন্নাহ

১. নফসে আম্মারাহ (প্রতারক আত্মা):

অর্থাৎ যে নফস, মানুষকে কুপ্রবৃত্তি ও জৈবিক কামনার দিকে আকৃষ্ট করে। সব সময় খারাপ চিন্তা-ভাবনা পোষণ করিয়ে রাখে। সব সময় অনৈতিক চাহিদা পূরণার্থে ব্যস্ত রাখে। সব সময় খারাপ কাজে উৎসাহিত করে। এই নফস সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত আছে,

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي - إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي - إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অর্থ: আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করিনা, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্ম-প্রবণ। কিন্তু সে নয়-যার প্রতি আমার রব অনুগ্রহ করেন। আমার রব, অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা ইউসুফ: ৫৩)

২. নফসে লাওয়্যামাহ (অনুশোচনাকারী আত্মা):

যে নফস অন্যায় করার পর আমাদের হৃদয়ে অনুশোচনার উদ্রেক করে। কুরআনে মহান রাব্বুল আলামিন নফসে লাওয়্যামাহ এর কথা উল্লেখপূর্বক কসম খেয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,য়রো শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়।" (সূরা কিয়ামাহ: ১-২)

তাফসিরে মা'রিফুল কুরআনে নফসে লাওয়্যামাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে নফসে লাওয়্যামাহ এমন একটি নফস-যা নিজের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়। অর্থাৎ, কৃত গোনাহ অথবা ওয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে নিজেকে ভর্ৎসনা করে। সৎকর্ম সম্পর্কেও নিজেকে এই বলে তিরস্কার করে—"আরও বেশি সৎকাজ সম্পাদন করে উচ্চমর্যাদা লাভ করলে না কেন? হযরত হাসান বসরি (রহি.) নফসে লাওয়্যামাহ-এর তাফসির করেছেন, 'নফসে মু'মিনা'। তিনি বলেন, আল্লাহ'র কসম! মুমিন তো নিজেকে সর্বদা সর্বাবস্থায় ধিক্কায় দেয়।

৩. নফসে মুত্বমায়িন্নাহ (প্রশান্ত আত্মা):

অর্থাৎ যে নফস, সকল কালিমা থেকে মুক্ত এবং যাবতীয় মহৎ ভাবনায় পরিতৃপ্ত। সমস্ত খারাপ কর্ম-প্রবণতা থেকে মুক্ত। এ- প্রশান্ত আত্মা সম্পর্কে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

يَأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً

'হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাও-সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।' (সূরা ফজর: ২৭-২৮)

তাফসিরে মা'রিফুল কুরআনে নফসে মুত্বমায়িন্নাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে-এ- নফস আল্লাহ'র প্রতি তার সৃষ্টিগত ও আইনগত বিধি-বিধানে সন্তুষ্ট; আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট। মহান রাব্বুল আলামিন এসব প্রশান্ত নফসকে সম্বোধন করে বলেন-আমার বিশেষ বান্দাদের কাতারভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

মূলত নফস একটি। অবস্থা ভেদে তার গুনে পরিবর্তন আসে। নফস আমাদের কর্মের দ্বারা পরিবর্তিত হয়। যদি তা লাগামহীন হয়ে যায়, তখন তা আম্মারায় পরিণত হয়। কিন্তু, যখন নফসে লাগাম পড়ানো হয়, তার গোলামী পরিত্যাগ করা হয়, তখন ধীরে ধীরে তা মুত্বমায়িন্নায় পরিনত হয়। এজন্যই বলা হয়-নফসে আম্মারাহ প্রায় সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। তাই আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে-নফসে আম্মারাহকে নফসে মুত্বমায়িন্নায় ডাইভার্ট করা।আর এর মাধ্যমেই আত্মশুদ্ধি অর্জিত হবে।

কুরাআনের আলোকে আত্মশুদ্ধি:

কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাযকিয়া অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির কথা বলেছেন।নিম্নে তা দেওয়া হলো-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুণ যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন। এবং তাদের পবিত্র (তাযকিয়া) করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।

-আল-বাকারা ১২৯

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

যেমন, আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র (তাযকিয়া) করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না।

-আল-বাকারা: ১৫১

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কেন অংশ নেই। আর তাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না। তাদের প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও দেবেন না। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও (তাযকিয়া) করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

-আল-ইমরান: ৭৭

لَقَد مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤمِنينَ إِذ بَعَثَ فيهِم رَسولًا مِن أَنفُسِهِم يَتلو عَلَيهِم آياتِهِ وَيُزَكّيهِم وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ وَالحِكمَةَ وَإِن كانوا مِن قَبلُ لَفي ضَلالٍ مُبينٍ

অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ(তাযকিয়া) করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।

أَلَم تَرَ إِلَى الَّذينَ يُزَكّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكّي مَن يَشاءُ وَلا يُظلَمونَ فَتيلًا

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজদেরকে পবিত্র মনে করে? বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে পবিত্র(তাযকিয়া) করেন। আর তাদেরকে সূতা পরিমাণ যুলমও করা হবে না।

আন-নিসা ৪৯

خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها وَصَلِّ عَلَيهِم إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُم وَاللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ

তাদের সম্পদ থেকে সদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ(তাযকিয়া) করবে। আর তাদের জন্য দো'আ কর, নিশ্চয় তোমার দো'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

আত-তাওবাহ্:১০৩

جَنّاتُ عَدنٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ خالِدينَ فيها وَذلِكَ جَزاءُ مَن تَزَكّى

স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আর এটা হল যারা পরিশুদ্ধ(তাযকিয়া) হয় তাদের পুরষ্কার।

ত্বহা:৭৬

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطانِ وَمَن يَتَّبِع خُطُواتِ الشَّيطانِ فَإِنَّهُ يَأمُرُ بِالفَحشاءِ وَالمُنكَرِ وَلَولا فَضلُ اللَّهِ عَلَيكُم وَرَحمَتُهُ ما زَكى مِنكُم مِن أَحَدٍ أَبَدًا وَلكِنَّ اللَّهَ يُزَكّي مَن يَشاءُ وَاللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ

হে মুমিনগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। আর যে শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করবে, নিশ্চয় সে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেবে। আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, তাহলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র(তাযকিয়া) হতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, পবিত্র(তাযকিয়া) করেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

আন-নূর:২১

وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخرى وَإِن تَدعُ مُثقَلَةٌ إِلى حِملِها لا يُحمَل مِنهُ شَيءٌ وَلَو كانَ ذا قُربى إِنَّما تُنذِرُ الَّذينَ يَخشَونَ رَبَّهُم بِالغَيبِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَمَن تَزَكّى فَإِنَّما يَتَزَكّى لِنَفسِهِ وَإِلَى اللَّهِ المَصيرُ

আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না এবং কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি তার বোঝা বহনের জন্য কাউকে ডাকে তবে তার বোঝার কোন অংশই বহন করা হবে না যদিও সে আত্মীয় হয়; তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করবে যারা তাদের রবকে না দেখেও ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে; আর যে ব্যক্তি পরিশুদ্ধি(তাযকিয়া) অর্জন করে সে নিজের জন্যই পরিশুদ্ধি(তাযকিয়া) অর্জন করে। আর আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন।

ফাতির:১৮

هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الأُمِّيّينَ رَسولًا مِنهُم يَتلو عَلَيهِم آياتِهِ وَيُزَكّيهِم وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ وَالحِكمَةَ وَإِن كانوا مِن قَبلُ لَفي ضَلالٍ مُبينٍ

তিনিই উম্মীদের(নিরক্ষরদের) মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র(তাযকিয়া) করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল।

আল-জুমআ:২

وَما يُدريكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّى

আর কিসে তোমাকে জানাবে যে, সে হয়ত পরিশুদ্ধ(তাযকিয়া) হত।
আবাসা:৩

وَما عَلَيكَ أَلّا يَزَّكّى

অথচ সে পরিশুদ্ধ(তাযকিয়া) না হলে তোমার কোন দায়িত্ব বর্তাবে না।

আবাসা:৭

قَد أَفلَحَ مَن تَزَكّى

অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে যে আত্মশুদ্ধি(তাযকিয়া) করবে।

আল-আলা:১৪

قَد أَفلَحَ مَن زَكّاها

নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে, যে তাকে পরিশুদ্ধ(তাযকিয়া) করেছে।

শামস: ৯

وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتقَى - الَّذي يُؤتي مالَهُ يَتَزَكّى

আর তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে।যে তার সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির(তাযকিয়া) উদ্দেশ্যে।

লাইল:১৭-১৮

হাদিসের আলোকে আত্মশুদ্ধি:

আবূ যার থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধও (তাযকিয়া) করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা? তারা তো বিফল হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেনঃ (১) যে ব্যক্তি পায়ের গোছার নিচে পরিধেয় ঝুলিয়ে পরে, (২) যে ব্যক্তি দান করার পর খোঁটা দেয় এবং (৩) যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে নিজের মাল বিক্রয় করে।

-ইবনে মাজাহ:২২০৮

যুহায়র ইবনু হারব ও আবূ মাআন রাকাশী... আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস এর মাতা উম্মু সুলায়মের কাছে একটি ইয়াতিম বালিকা ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বললেনঃ এই মেয়ে, তুমি তো বেশ বড় হয়েছ; তবে (আমার বয়স বড় না হোক) তুমি দীর্ঘজীবী না হও। তখন ইয়াতীম বালিকাটি উম্মু সুলায়মের কাছে ফিরে গেল। তখন উন্মু সুলায়ম বললেন, তোমার কী হয়েছে? ওহে আমার পিচ্চি মিষ্টি মেয়ে। মেয়েটি বলল, নাবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বদ দু'আ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ আমার বয়স যেন বড় না হয় (আমি দীর্ঘজীবী না হই)। সুতরাং এখন থেকে আমি আর বয়সে বড় হব না। অথবা সে سنّي এর স্থলে فرنى (আমার চুল) বলেছিল। একথা শুনে উম্মু সুলায়ম তাড়াতাড়ি ওড়না পরে বেরিয়ে পড়েন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন তাঁকে (লক্ষ করে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কী ব্যাপার, হে উম্মু সুলায়ম! তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনি কি আমার ইয়াতীম বালিকাটিকে বদ দু'আ করেছেন? তিনি বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! তা কি? (কিসের বদ দু'আ?) উম্মু সুলায়ম বললেন, সে তো বলছে যে, আপনি তাকে বদ দু'আ করেছেন যেন তার বয়স না বাড়ে কিংবা তার চুল বৃদ্ধি না পায়। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকী হাসি দিয়ে বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! তুমি কি জাননা যে, আমার প্রতিপালকের সঙ্গে এই মর্মে আমি শর্ত (প্রতিশ্রুতি) বদ্ধ হয়েছি এবং আমি বলেছি যে, আমি তো একজন মানুষ। মানুষ যাতে সন্তুষ্ট হয় আমিও তাতে সন্তুষ্ট হই। আমিও অসন্তুত হই যে ভাবে মানুষ রাগান্বিত হয়ে থাকে। সুতরাং আমি আমার উম্মাতের কোন ব্যক্তি কে বদ দু'আ করলে সে যদি তার যোগ্য না হয় তাহলে তা তার জন্য পবিত্রতা,

আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়া) ও নৈকট্যের মাধ্যম বানিয়ে দিন, যা তাকে কিয়ামত দিবসে সে আপনার নৈকট্য লাভ করিয়ে দিবে।

-সহীহ মুসলিম:৬৩৮৯

আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত যে, যাইনাব (রা.) এর আসল নাম ছিল বাররাহ্। তাই বলা হলো, তিনি যেন আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়া) করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নামকরণ করলেন যাইনাব।

-সহীহ মুসলিম: ৫৫০০

আবু বাকর বিন আবু মুহাইর বর্ণনা করেন যে, আমি জানতে পেরেছি যে, আবু বাকর আস সিদ্দিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহতো বলেছেনঃ "তোমাদের এবং আহলে কিতাবদের লম্বা লম্বা আশা আকাঙক্ষা কোন কাজে আসবে না। যে-ই খারাপ কাজ করবে, সে-ই তার প্রতিফল ভোগ করবে।" (সূরা আন নিসা-১২৩) এ আয়াতের পর আর আত্মশুদ্ধির (তাযকিয়া) উপায় কী থাকে? এ দ্বারা তো বুঝা যায়, যে কোন খারাপ কাজই আমরা করবো, তার শাস্তি আমাদের ভোগ করতেই হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে আবু বাকর, আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। আচ্ছা, তোমার কি কখনো রোগ-ব্যাধি হয় না? তুমি কি কখনো দুঃখ কষ্ট ভোগ কর না? তুমি কি কখনো দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে আক্রান্ত হওনা? তুমি কি কখনো পেটের ব্যথায় আক্রান্ত হও না? আবু বকর বললেনঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ওটাইতো সেই কর্মফল, যা তোমাদেরকে দেয়া হয়।

-মুসনাদ আহমাদ: ৬৯

হাজ্জাজ ইবনু মিনহাল... আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির সম্পত্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে যে মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহ সম্মুখীন হবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ থাকবেন। এর সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেনঃ "যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মুল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না। তাদের প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও

দেবেন না। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও (তাযকিয়া) করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৩ঃ ৭৭)" বর্ণনাকারী বললেন, এরপর আশআস ইবনু কায়েস সেখানে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আবূ আবদুর রহমান তোমাদের নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন? আমরা বললাম, এ রকম এ রকম বলেছে। তখন তিনি বললেন, এ আয়াত তো আমাকে উপলক্ষ করেই অবতীর্ণ হয়েছে। আমার চাচাতো ভাইয়ের এলাকায় আমার একটি কূপ ছিল। এ ঘটনায় জ্ঞাত হয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হয়তো তুমি প্রমাণ উপস্থাপন করবে নতুবা সে শপথ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। সে তো শপথ করে বসবে। অনন্তর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পত্তি হরণ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে সে আল্লাহর সম্মুখীন হবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহই তার উপর ক্রুদ্ধ থাকবেন।

-বুখারী: ৪১৯৩

ইবনু মাসঊদ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের সম্পদ গ্রাসের জন্য মিথ্যা কসম করবে, এমন অবস্থায় আল্লাহ সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটবে যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধানিত থাকবেন। আবদুল্লাহ বলেন, তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রমাণ হিসাবে এ আয়াত পাঠ করেনঃ যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রতি এবং নিজেদের শপথ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ (তাযকিয়া) করবেন না; তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। (৩ঃ ৭৭)

-মুসলিম: ২৫৬

যাযিদ ইবনু আরকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের কাছে তেমনই বলব যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন। তিনি (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেনঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার কছে আশ্রয় চাই, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ আপনি আমার নফসে (অন্তর) তাকওয়া দান করুন এবং একে পরিশুদ্ধ (তাযকিয়া) করে দিন। আপনি একে সর্বোত্তম পরিশোধনকারী, আপনিই এর মালিক ও এর অভিবাবক। হে আল্লাহা আমি আপনার

কাছে আশ্রয় চাই অনুপকারী ইলম থেকে ও ভয় ভীতিহীন কলব থেকে; অতৃপ্ত নফস থেকে ও এমন দুআ থেকে যা কবুল হয় না।

-মুসলিম: ৬৬৫৮

আবূ বাকর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এক ব্যক্তি অপন এক ব্যক্তির প্রশংসা করল। এ কথা শুনে তিনি বললেন, হতভাগা। তুমি তো তোমার সঙ্গীর গর্দান কেটে দিয়েছ, তুমি তো তোমার সঙ্গীর গর্দান কেটে ফেলেছ। এ কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমাদের কারো যদি তাঁর সঙ্গীর প্রশংসা করতেই হয় তবে সে যেন বলে 'অমুক সম্পর্কে আমার ধারণা' আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবে জানেন, (আমি তাঁর ভিতরের অবস্থা সম্পর্কে জানি না)। আর আল্লাহর উপর খোদকারী করে কারো পরিশুদ্ধতা (তাযকিয়া) ঘোষণা করছি না। পরিণাম সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহরই আছে। (তবে) আমি মনে করি সে এরূপ। যদি তা জানে।

-মুসলিম: ৭২৩০

খালিদ ইবনু আসলাম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উমার-এর সঙ্গে বের হলাম। তখন তিনি বললেন, এ আয়াতটি ("সে দিন যখন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে দাগিয়ে দেয়া হবে তাদের কপাল, তাদের পাঁজর এবং তাদের পৃষ্ঠদেশ, বলা হবেঃ এগুলো হল তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং যা তোমরা জমা করে রাখতে তার স্বাদ গ্রহণ কর।" যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের। এরপর যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হলে আল্লাহ তা সম্পদের পরিশুদ্ধকারী (তাযকিয়া) করেন।

-বুখারী: ৪৬৬১

আবূদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে কি তোমাদের অধিক উত্তম কাজ প্রসঙ্গে জানাব না, যা তোমাদের মনিবের নিকট সবচেয়ে বিশুদ্ধ (ওয়াজকাহা- তাজকিয়ার ধাতুমুল), তোমাদের সম্মানের দিক হতে সবচেয়ে উঁচু, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান-খাইরাত করার চেয়েও বেশি ভাল এবং তোমাদের শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের সংহার করা ও তোমাদেরকে

তাদের সংহার করার চাইতেও ভাল? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা'আলার যিকর। মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার যিকরের তুলনায় অগ্রগণ্য কোন জিনিস নেই।

-তিরমিজি: ৩৩৭৭

তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির পরিচয়:

তাযকিয়া শব্দটি আরবি যাকাত শব্দ হতে উৎসারিত, যার অর্থ হল পবিত্রতা, পবিত্র করা, বৃদ্ধি করা, পরিশুদ্ধ করা। পরিভাষায় নাফস বা অন্তরকে তার পশুত্বসুলভ বক্রচিন্তা, কুবৃত্তি ও অসৎপ্রবণতাসমূহ থেকে মুক্ত ও পবিত্রকরণ এবং মানবিক মূল্যবোধ, সৎচিন্তা, ও সুন্দর চরিত্রসমূহ দ্বারা তার উন্নতিসাধনকে তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি বলে।

আবদুল্লাহ ইবনু মু'আবিয়া আল-গাদিরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমাতে আরয করেন, مَا تَزْكِيَّةُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ؟ - "ব্যক্তি কর্তৃক তার নাফসের তাযকিয়াহ বলতে কী বোঝায়?" তিনি উত্তর দেন, أَن يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ -"ব্যক্তির নাফসের তাযকিয়া হলো, সে এই মর্মে বিশ্বাস পোষণ করবে যে, সে যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তা'আলা তার সাথেই রয়েছেন। অর্থাৎ প্রতিটি কাজ করার সময় তাঁকে স্মরণ করবে এবং তাঁকে ভয় করবে ও একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিটি কাজ সম্পাদন করবে।

মোট কথা, তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি বলতে একজন ব্যক্তির আকীদা-বিশ্বাস, আমাল-আখলাক, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, লেনদেন ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি ইত্যাদি সবকিছুরই পরিশুদ্ধিকরণকে বোঝায়।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম একটি স্বভাবগত ও বাস্তবসম্মত জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানুষের জৈবিক চাহিদাসমূহকে অস্বীকার করে না এবং এগুলো পূরণের জন্য চেষ্টা ত্যাগ করতেও বলে না। বরং ইসলামের নির্দেশ হলো- মানুষ তার স্বভাবগত জৈবিক চাহিদাগুলো পূরণ করবে এবং এ জন্য চেষ্টাও চালাবে। তবে তাকে এ ক্ষেত্রে নাফসের ওপর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ও শাসন প্রতিষ্ঠা

করতে হবে। তাকে তার চাহিদাগুলো পূরণের ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় ও হালাল-হারাম বাছ-বিচার করতে হবে।

হাসান আল বাসরী (রহি.) বলেছেন, "মুমিন তার নফসের তত্ত্বাবধায়ক। সে তার নিজের নফসের হিসাব নিয়ে থাকে। যারা দুনিয়ায় নিজেদের নফসের হিসাব নেয়, কিয়ামাতের দিন তাদের হিসাব সহজ হবে। আর যারা হিসাব না নিয়েই ছেড়ে দেয়, কিয়ামাতের দিন তাদের হিসাব কঠিন হবে।"

মালেক ইবনে দিনার বলেন: আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দার প্রতি দয়া করেন-যে তার নফসকে বলে, হে নফস! তুমি এই কাজ করো, আর এই কাজ করো না। অতঃপর, জোর করে তার ওপর লাগাম পরিয়ে দেয় এবং আল্লাহর কিতাবকে তার উপর অপরিহার্য করে দেয়। তখন কুরআন তার জন্য চালক হয়ে যায়। (অর্থাৎ, কুরআন তাকে পথ দেখায়)।

আবু সুফিয়ান রহি. বলেন: যখন কোনো ব্যক্তি ভালো কাজ করার ইচ্ছে করে, তখন তার নফস থেকে সুগন্ধি ছড়াতে থাকে এবং যখন কোনো ব্যক্তি খারাপ কাজ করার ইচ্ছে করে, তখন তার নফস দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে।

হযরত মালেক বিন দিনার রহি. বলেন: যে সবসময় নফসের অনুগত, শয়তান তার কাছে বেশি যাতায়াত করে না। কেননা, শয়তানের কাজ তো নফসের মাধ্যমেই সম্পাদিত হচ্ছে।

আত্মশুদ্ধিই সফলতার মূল:

ইসলামে তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের প্রিয় নবীজী(সা:) এর দাওয়াতের মূল মিশনই ছিলো উম্মতের তাযকিয়া এবং তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধিই হলো সফলতার মূল।সূরা শামসে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা এর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে তার বিশাল সৃষ্টির নামে শপথ করেছেন, যা নিঃসন্দেহে আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ করে। তিনি বলেন,

وَالشَّمسِ وَضُحاها - وَالقَمَرِ إِذا تَلاها - وَالنَّهارِ إِذا جَلّاها - وَاللَّيلِ إِذا يَغشاها - وَالسَّماءِ وَما بَناها - وَالأَرضِ وَما طَحاها - وَنَفسٍ وَما سَوّاها - فَأَلهَمَها فُجورَها وَتَقواها - قَد أَفلَحَ مَن زَكّاها - وَقَد خابَ مَن دَسّاها.

কসম সূর্যের ও তার কিরণের, কসম দিবসের, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে, কসম চাঁদের, যখন তা সূর্যের অনুগামী হয়, কসম রাতের, যখন তা সূর্যকে ঢেকে দেয়, কসম আসমানের এবং যিনি তা বানিয়েছেন, কসম যমীনের এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, কসম নাফ্সের এবং যিনি তা সুসম করেছেন, অতঃপর তিনি তাকে অবহিত করেছেন তার পাপসমূহ ও তার তাকওয়া সম্পর্কে। নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে, যে তাকে পরিশুদ্ধ করেছে, এবং সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তা (নাফস)-কে কলুষিত করেছে।

আত্মশুদ্ধি অর্জনের পথে বাধা:

ক.অহংকার:

অহংকার পতনের মূল-এ-কথা প্রচলিত। নৈতিক মূল্যবোধের জায়গা থেকে এটি যেমন সত্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও এ-কথা প্রমাণিত যে, অহংকার ও দাম্ভিকতা পতন ডেকে আনে।

আত্ম-অহমিকা বলা হয়-নিজের গুনে নিজেই মুগ্ধ হয়ে নিজেকে বড় মনে করা। আর অহংকার বলা হয়-নিজের গুনে নিজেই মুগ্ধ হয়ে নিজেকে বড় ভাবার পাশাপাশি, অন্যকে তুচ্ছ মনে করা। শরিয়তের দৃষ্টিতে উভয়টিই হারাম।

আত্ম-অহমিকা, দাম্ভিকতা ও অহংকার নফসের এক নিকৃষ্ট ব্যাধি। নফসের এই ব্যাধি দূর করা আমাদের উপর আবশ্যক। কেননা, অহংকারী মানুষকে আল্লাহ খুব অপছন্দ করেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন,

'নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) অহংকারীদের ভালোবাসেন না।'

মহান আল্লাহ'র সঙ্গে কৃত সর্বপ্রথম গোনাহ হলো অহংকার। আল্লাহ তাআলা বলেন,

'যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করল। শুধু সে অহংকারবশত সিজদা করতে অস্বীকার করল। আর সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।(সূরা নাহল:২৩)

অহংকার, ইবলিসকে শয়তানে পরিণত করেছে। সে অহংকার করেছিল নফসের প্ররোচনায়।লাগামহীন নফস যখন ইবলিশের উপর প্রাধান্য লাভ করে, তখন সে অহংকারবশত তার স্বীয় রবের হুকুম অমান্য করে।ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

অহংকার শয়তানি কাজ। আর অহংকার মুক্ত থাকা, আল্লাহ ওয়ালাদের ওয়ালাদের কাজ।অহংকার একজন মানুষের পরিচয় প্রকাশ করে, সে কি আল্লাহওয়ালা নাকি শয়তান ওয়ালা। এতদসত্ত্বেও আজ আমরা অহংকার নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত।

অহংকারীদের জায়গা হচ্ছে জাহান্নাম। যেটা রাসূল (সা.) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন,

হারিস ইবনু ওয়াহাব খুযাঈ রাযি. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি নবীজীﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের পরিচয় বলবো না? তারা দুর্বল এবং অসহায়; কিন্তু তারা যদি কোনো ব্যাপারে আল্লাহ'র নামে কসম করে বসেন, তাহলে তা পূরণ করে দেন। আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের পরিচয় বলবো না? তারা রূঢ় স্বভাব, অধিক মোটা এবং অহংকারী তারাই জাহান্নামী।

অপর একটি হাদীসে এসেছে...

অহংকারী মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একজন সাহাবি বলেন, মানুষ তো চায় যে তার কাপড় সুন্দর হোক এবং তার জুতা সুন্দর হোক (এটা কি অহংকারবলে গণ্য হবে?) রাসুল (সা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর। অতএব তিনি সুন্দর পছন্দ করেন। তবে অহংকার হচ্ছে সত্য প্রত্যাখ্যান ও মানব অবমূল্যায়ন।

একবার বনি ইসরাঈলের এক ব্যক্তি গর্ব করলে, আল্লাহ তাআলা তাকে কঠিন শাস্তি দেন। রাসুল (সা.)-এর যুগেও এমন একটি ঘটনা ঘটে যায়।

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, একদা এক ব্যাক্তি এক জোড়া জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরে (রাস্তা দিয়ে) চলছিল। তা নিয়ে তার খুব গর্ব বোধ হচ্ছিলো। তার জমকালো লম্বা চুলগুলো সে খুব যত্নসহকারে আঁচড়ে রেখেছিলো। হঠাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে ভূমিতে ধসিয়ে দেন এবং সে কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই নিচের দিকে নামতে থাকবে।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা অহংকারী ও দাম্ভিকের সঙ্গে কথা বলবেন না, তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, তাকে গোনাহ থেকে পবিত্র করবেন না।

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'তিন ব্যক্তির সঙ্গে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদের গোনাহ থেকেও পবিত্র করবেন না,তাদের

দিকে রহমতের দৃষ্টিতেও তাকাবেন না এবং তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তারা হচ্ছে বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যুক রাষ্ট্রপতি ও দাম্ভিক ফকির।'

একটু ভাবুন-একজন অহংকারী ব্যক্তির ব্যাপারে এত বড় বড় ওয়িদ এসেছে। তবু আজ আমরা দাম্ভিকতা আর অহমিকায় লিপ্ত। আমরা নিজেরাই নিজের গুণে নিজেকে বড় ভাবতে শুরু করি। আর কেউ যদি আমাদের কাজের দরুন প্রশংসা করে, তখন তো পা মাটিতেই পড়তে চায় না। আর এটা আমাদের জন্য হয় খুবই ক্ষতিকর। কেননা, নিজের প্রশংসা অন্যের কাছে শুনে আমরা ধীরে ধীরে কাজের প্রতি উদাসীন হয়ে যাই নিজের মধ্যে যে যোগ্যতাটুকু ছিলো তাও হারিয়ে বসি। মোটকথা, অহংকার একজন মানুষের ক্ষেত্রে ইহকাল-পরকাল উভয় জগতের জন্য ক্ষতিকর।

তাই, আমাদের ওপর আবশ্যক হলো-যত দ্রুত সম্ভব অহংকার নামক নফসের ব্যাধি দূর করা। নফসের ব্যাধি দূর না করা অব্দি আমরা আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারবো না।

খ.রাগ:

রাগ নফসের নফসের এক অনন্য ব্যাধি। রাগ এমন, যা একজন মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। রাগের সময় বিবেক বুদ্ধি অচল হয় পড়ে; হুশ-জ্ঞান পরিপূর্ণভাবে লোপ পায়। যার কারণে অবাঞ্ছিত, অপ্রত্যাশিত কথাবার্তা এমনিতেই মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়। আর সেখান থেকেই শুরু হয় ঝগড়াঝাটি, মারামারি, খুন-খারাবি ইত্যাদি। এই রাগের অশুভ পরিণতিতে ঝরে পড়ে কত প্রাণ, নষ্ট হয় কত ধন-সম্পদ। শুধু তাই নয়-মামলা-মোকদ্দমার বেড়াজালে আটকে পড়ে হারাতে হয় মনের প্রশান্তি।

রাগ নফসের এমন ব্যাধি, যা আপনাকে সফলতার মঞ্চ থেকে টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় নামিয়ে দিবে। এমনকি, আপনার সুখি সংসারেও বয়ে আনবে অশান্তির ঝড়। আর তাছাড়া, রাগ নষ্ট করে আমাদের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। এজন্য, এই রাগকে নিয়ন্ত্রন করা আমাদের ওপর আবশ্যক। নয়তো, এই রাগ আমাদের নিমজ্জিত করবে অধঃপতনের অতল গহ্বরে।

রাগ এমন এক ব্যাধি, যা মানুষের জ্ঞান'কে হ্রাস করে। কেননা, রাসুল সা. বলেছেন- الغضب يأكل العقل অর্থাৎ:" রাগ মানুষের জ্ঞানকে খেয়ে ফেলে"। তাহলে আপনিও কি চান, রাগ আপনার জ্ঞান'কে খেয়ে ফেলুক? আপনিও কি চান-আপনার অর্জিত জ্ঞানটুকু রাগের কারণে

লোপ পাক? আপনি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন-যারা সবসময় রাগারাগি করে, তাদের অধিকাংশই জ্ঞানহীন। রাগারাগি করতে করতে এক পর্যায়ে তাদের আকল লোপ পায়। তাদের বিবেক বুদ্ধি অচল হয়ে পড়ে। যার ফলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তো পারে-ই না; এমনকি সহজ বিষয়েও পুরো গোলমাল পাকিয়ে বসে।

কোনো এক বিষয় নিয়ে মতানৈকা তৈরি হলে, কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা আপনাকে দলিল এবং যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবে, প্রকৃতপক্ষে তারাই হচ্ছে জ্ঞানী। আবার কিছু মানুষ আছ্ন, যারা দলিল এবং যুক্তি পেশ করে সমস্যার নিরসন করতে না-পেরে, আপনার সাথে রাগারাগি করবে। কটু কথা বলবে। একপার্যায়ে গালাগালি করবে তবু তার ভুল স্বীকার করবে না। তারাই হচ্ছে ওই লোক, যাদের জ্ঞান'কে 'রাগ' খেয়ে ফেলেছে। যারা দলিল এবং যক্তি পেশ করে সমস্যা নিরসন করতে পারে না; আবার নিজের ভূলও স্বীকার করে না, তারাই ঐ লোক, যারা স্বীয় ‘জ্ঞান'কে বিক্রি করেছে রাগের কাছে।

এক ব্যক্তি শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহি.)-এর সন্তানকে জিজ্ঞেস করল, এই যুগের সবচেয়ে বড় আল্লাহ'র ওলি কে? তিনি বললেন মসজিদে গিয়ে দেখুন মসজিদের এক কোণে তিনজন ব্যক্তি ইবাদতে মশগুল। তাদের কাছে গিয়ে এক-এক করে প্রত্যেকের গালে একটি করে চড় দিবেন। তারপর আমার কাছে ফিরে আসবেন।

ওই ব্যক্তি তার কথামতো মসজিদে গিয়ে প্রথম ব্যক্তির গালে ঠাস করে একটি চড় বসিয়ে দিল। তখন ঐ ব্যক্তি বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেল। সেও পাল্টা তার গালে একটি চড় বসিয়ে দিল। তারপর সে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে গেল। তার গালে জোরে একটা চড় বসাল। তখন ওই ব্যক্তি মাথা তুলে তার দিকে তাকাল এবং মাথা নিচু করে আবার ইবাদতে মশগুল হয়ে গেল। সর্বশেষ, সে তৃতীয় ব্যক্তির কাছে গেল। তার গালেও একটা চড় বসাল। তখন ওই ব্যক্তি বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেল এবং তার হাত ধরে বলতে লাগল-ভাই, আপনি আমাকে মেরেছেন, আপনি হাতে ব্যাথা পাননি তো?

ওই ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহি.-এর ছেলের কাছে ফিরে আসল। অতঃপর ঘটে যাওয়া ঘটনাটি তার কাছে বর্ণনা করল। তখন তিনি জবাবে বললেন, ওই তৃতীয় ব্যাক্তিই হচ্ছে বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় ওলি।

রাখা হচ্ছে নফসের অস্ত্র। এই রাগকে ব্যবহার করেই নফস আপনাকে বিভিন্ন জায়গায় ছোট করছে, আপনাকে আমাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করছে।

রাগ নেই, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এক সাহাবি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে োবললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে অল্প কথায় কিছু নসিহত করুন।' তখন রাসুল (সা.) বললেন, 'রাগ বর্জন করো।' সাহাবি কয়েকবার বললেন, 'আরও নসিহত করুন।' কিন্তু, প্রত্যেকবারই রাসুল (সা.) বললেন, 'রাগ বর্জন করো।'

রাগ নিয়ন্ত্রণ সুখের চাবিকাঠি: সংসারের আলোর প্রদীপ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহি -এর স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলেন। যখন দাফনের সময় হলো, তিনি বলে উঠলেন, 'হে উম্মে আবদুল্লাহ! তোমার কবর শান্তিময় হোক। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের বৈবাহিক জীবনে আমাদের মধ্যে একবারও ঝগড়া-বিবাদ হয়নি।'

এ-কথা শুনে তার এক ছাত্র অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে ইমাম! এটা কীভাবে সম্ভব?'

জবাবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহি, বললেন, 'যখনই আমি তার প্রতি রেগে যেতাম, তখন তিনি চুপ থাকতেন, আর যখন তিনি আমার প্রতি রেগে যেতেন, তখন আমি চুপ থাকতাম। তাই আমাদের মধ্যে কখনোই ঝগড়া-বিবাদ হয়নি।

রাগ মানবিক আবেগের অংশ বিশেষ। রাগ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তবে অনিয়ন্ত্রিত রাগ মারাত্মক ক্ষতিকারক। জ্ঞানীরা বলেন, রাগ হলো বারুদের গুদামের মতো। আগুনের স্ফুলিঙ্গের ছোঁয়ায়, সব কিছু ধ্বংস করে দিতে পারে এই রাগ। এই কারণে রাগ নিয়ন্ত্রণের কোনো বিকল্প নেই। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, কোনো কোনো মানুষ দ্রুত রেগে যায় এবং তাদে রাগও প্রচন্ড। এমনকি, মানুষ রেগে গিয়ে গালিগালাজ শুরু করতে পারে, মানুষের সঙ্গে মেলামেশাও বাদ দিতে পারে। এ ধরনের ব্যক্তিরা রাণের কারণে নানা দৈহিক রোগেও আক্রান্ত হতে পারে।

শরিয়ত মানুষকে রাগ নিয়ন্ত্রণ করার নির্দেশ দিয়েছে। রাগ মানুষকে জ্ঞান, বিবেক ও ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। রাগের কারণে মানুষের আচার-আচরণ ও চিন্তা-চেতনায় খারাপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই, রাগান্বিত অবস্থায় ক্ষমা করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে শরিয়ত।

বিশেষ ঋকরে কোনো ব্যক্তি যদি প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকার পরও প্রতিশোধ না নেয় এবং ক্ষমা করে দেয়, তাহলে তার এ কাজটি শরিয়তের দৃষ্টিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত।

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, বড় বড় মনিষীরা ক্ষমা করার ক্ষেত্রে ছিলেন অগ্রগামী। তারা রাগান্বিত হলে সূরা আল ইমরানের ১৩৪ নম্বর আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল সব অবস্থায়ই অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ দমন করে ও অন্যের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেয়। এ ধরনের সৎলোকদের আল্লাহ অত্যন্ত ভালোবাসেন।

মহান ও আধ্যাত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ ব্যক্তিরা সব সময় অন্যের জন্য দুয়া করেন। মানুষকে সংশোধন করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন জানান। তাদের কথা হলো, কোনো আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব আপনার ওপর রেগে থাকলে ক্ষুব্ধ লোকটির কাছে গিয়ে নম্রভাবে তাকে স্বান্তনা দিন, তার ক্ষোভ উপশমের ব্যবস্থা করুন, যাতে সে শান্ত হয়। এমনটি করলে ক্ষুব্ধ ব্যক্তিটির ক্ষোভ কমবে, তার কোনো ক্ষতি করার পরিকল্পনা থাকলে তা থেকে সরে আসবে।

বস্তুত রাগ মানুষের জীবনকে সহজেই বিষাক্ত করে তুলতে পারে। রাগের মাথায় এমন সব কাজ ঘটে যেতে পারে-যা ব্যক্তি, সমাজ তথা গোটা বিশ্বের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ। তাই রাগ হলে বেশি বেশি 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পড়তে হবে। রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য রাসুল সা. আমাদেরকে উত্তম নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তা হলো-যদি হঠাৎ করে রাগ উঠে যায়, তাহলে বসে পড়ো। এরপরেও যদি রাগ প্রশমিত না হয়, তাহলে শুয়ে পড়ো। এরপরেও যদি রাগ কন্ট্রোল করতে তুমি ব্যর্থ হও. তখন অজু করে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করো, ইনশাআল্লাহ রাগ এমনিতেই কমে যাবে।আর এইভাবে রাগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমরা ‘রাগ’ নামক নাফসের ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবো এবং আত্মশুদ্ধির পথে এগিয়ে যাবো।

গ. গীবত:

নফসের এক অন্যতম ব্যাধি হচ্ছে, গীবত। গীবত নফসে আম্মারাহ-এর খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।গীবত বলা হয়, কারো অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্পর্কে এমন মন্তব্য করা, যা শুনলে

সে কষ্ট পাবে।

গীবত করার পিছনে কিছু কারন সমূহ:

মানব প্রবৃত্তির কাছে গীবত খুবই মজাদার! মজাদার হওয়ার কয়েকটি কারণ,

১। নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা বিরক্তিকর। তাই, অন্যের অগোচরে তার দোষ চর্চা করে, নিজের দোষ মস্তিষ্ক থেকে যেন সরিয়ে নেয়া যায়।

২। নিজের সুনাম ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সহজ উপায়, গীবত। কেননা, সরাসরি কেউ তার নিজের প্রশংসা, নিজের বড়ত্ব, অন্যত্র প্রকাশ করতে পারে না।

আর তাছাড়া, নিজের বড়ত্ব নিজে বলে বেড়ানো অনেকটা দৃষ্টিকটু। তাই এ ব্যাক্তি নিজের প্রশংসা নিজে না করে, অন্যেদের গীবতের মাধ্যমে সহজেই প্রমান করে-সকলেই দোষযুক্ত; আমি কত ভালো!

নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করতে, অন্যকে ছোট করতে- অনেকেই এ ধরনের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একে অপরের গীবত করে থাকে।

নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করতে অন্যকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। অথচ, এইক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কাকে পছন্দ করেন, কাকে ভালোবাসেন- আমরা কেউ বলতে পারি না। আবার, কার কোন একটি আমল আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করে, তার সেটাও আমরা জানি না! তাহলে কীভাবে একজন ব্যক্তিকে আমরা ছোট বা হেয় করতে পারি? যাকে হেয় করতে যাচ্ছেন, সেই ব্যক্তি যদি রবের প্রিয় বান্দা হয়ে থাকে, তাহলে নিজের অবস্থা কী হবে-একটু চিন্তা করা প্রয়োজন। তাই, কাউকে ছোট করার মানসিকতাই রাখা ঠিক নয়। কেননা, এটা গীবতের উৎস।

হিংসা-বিদ্বেষের তাড়নায় অনেকেই অন্যের গীবতে জড়িয়ে পড়ে। কারো উন্নতি বা প্রশংসা দেখলেই তৃতীয় পক্ষের কাছে তার অগোচরে দোষ চর্চা করে। শুধু তাই নয়-ব্যক্তিজীবনের অনেক গোপনীয় কথাও অন্যত্র প্রকাশ করে দেয়, যেন ঐ ব্যক্তিকে ছোট করা যায়। অনেকেই আছে, যারা সব সময় বেহুদা কাজে সময় ব্যয় করে; সব সময় অবসর সময় কাটায়, তারাই

অন্যের গীবতে সিদ্ধহস্ত। কারণ, তাদের কোনো কাজ থাকে না। সময় কাটানোর মাধ্যম হিসাবে তারা ঐ নোংরা পথকেই বেছে নেয়।

তাইতো বলা হয়-গীবত থেকে বেঁচে থাকতে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকো; আড্ডাবাজি পরিহার করো।

গিবতের প্রকারভেদ:

১. দৈহিক কাঠামোর গীবত :

কারো কাছে কোনো ব্যক্তির দৈহিক ত্রুটি উল্লেখ করাও গীবত। যেমন: এক ব্যক্তি খুব মোটা, তার নাক বোঁচা, চোখ খুবই ছোট, চোখে দেখে না, মাথায় চুল নেই, পেটে ভূড়ি আছে, ইত্যাদি।আজকাল এটাকে আমরা গীবত-ই মনে করিনা।

একজন মানুষের অগোচরে তার শারীরিক গঠন নিয়ে কত যে মন্তব্য করি- তার ইয়ত্তা নেই। অথচ, এটাই অনেক বড় ধরনের গীবত; কেননা, আপনি যদি তার উপস্থিতিতে তার সামনাসামনি এই কথাগুলো বলেন তাহলে অবশ্যই সে কষ্ট পাবে। সেজন্যই তো আপনি তার অনুপস্থিতিতেই অন্যের কাছে তার শারীরিক গঠন নিয়ে আলাপ করলেন।

২. পোশাকের গীবত:

যেমন: অমুকের পোশাক কত সস্তা, অমুকের পোশাক খুবই বিশ্রী। দেখ, দেখ, কেমন একটা জামা পড়েছে। সব সময় ছেঁড়া জামা পড়ে, ইত্যাদি।

৩. বংশের গীবত:

তুচ্ছ করার জন্য কাউেক বলা, অমুকের বংশ নিচু, অমুকের পূর্ব পুরুষেরা ছিলো-কলি-মজুর বা চোর-ডাকাত ইত্যাদি! অমুকের তো কোনো বংশই নেই, ইত্যাদি বলা।

৪. অভ্যাস বা আচার-আচারণের গীবত:

কোন ব্যক্তির আচার-ব্যবহার নিয়ে সমালোচনা করা। যেমন: সে মানুষকে কষ্ট দিয়ে কথা বলে, ব্যবহার খারাপ, অভদ্র, পেটুক, অলস, ইত্যাদি।

৫. ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে গীবত:

কোনো ব্যক্তির অসহায় অবস্থা অভিনয় বা ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে দেখানো। যেমন: অন্ধ, বোবা, ইত্যাদি সেজে দেখানো। এমনকি সমালোচনার জন্য কারো চালচলন, কথা, পোশাক ইত্যাদি নকল করে অভিনয় করাটাও গীবত। সরাসরি নামোল্লেখ না করে এমন কিছু ইঙ্গিতবহ উপমা ব্যবহার করে দোষ বর্ণনা করা যে, লোকেরা উপমা শুনেই বুঝে ফেলে কার কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ গীবত করার সময় নাম না নিলেও এমন ভাবে কোন ব্যাক্তির দোষ ত্রুটি বলা যে, মানুষের আর বুঝতে বাকি থাকে না-কার কথা বলা হচ্ছে। এটাও গীবতেরই অন্তর্ভুক্ত।

৬. কানের গীবত:

নিজে না-বললেও কারো গীবত শোনা এবং শোনার সময় কোনরুপ বাধা না-দেয়া-এটাই কানের গীবত।

৭. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে গীবত:

নিজের হাত, পা, চোখ ইত্যাদির মাধ্যমে অন্য লোকের নিকট কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা। যেমন: কোনো ব্যক্তি কোনো মজলিস থেকে উঠে চলে যাওয়ার পর তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য চোখ অথবা হাতের ব্যবহার করা।

৮. লেখনীর মাধ্যমে গীবত :

কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য মেসেঞ্জারে তৃতীয় পক্ষের কাছে তার দোষ লিখে মেসেজিং করা। কারো ব্যক্তিগত কথপোকথন স্ক্রিনশট নিয়ে অন্যদের সাথে শেয়ার করা।

এ- গীবত আমাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। কিছু হলেই সঠিকটা যাচাই-বাছাই না-করেই মেসেঞ্জারে একে অন্যের দোষ বর্ণনা করি! ম্যাসেঞ্জারের ব্যক্তিগত কথাবার্তা স্ক্রিনশট দিয়ে অন্যদের সাথে শেয়ার করি-এগুলোও গীবত।

৯. দাওয়াতে লিপ্ত এক মুসলিম অন্য মুসলিমের গীবত:

আজ মাঠে কাজ করা অধিকাংশ দাঈ-রা একজন আরেকজনের গীবতে ব্যস্ত। ফলে, ব্যক্তির যতটা ক্ষতি যতটা হচ্ছে, তারচেয়ে দাওয়াতের ক্ষেত্র বেশী নষ্ট হচ্ছে। সাধারন মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। দলাদলি বেড়েই চলেছে। এই ফাঁকে ইসলামের শত্রুরা দীনের ক্ষতি করার আরো বেশি সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে।

গীবতের পরিণতি:

গীবতের পরিণতি প্রসঙ্গে হাদীসে কুদসীতে এসেছে, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন বান্দাকে তার আমলনামা খোলা অবস্থায় দেয়া হবে। সে তাতে এমন কতগুলো নেকী দেখবে, যা সে আমল করেনি। সে বলবে, হে প্রভু! আমি এই নেকীগুলো অর্জন করিনি। তিনি বলবেন, 'লোকেরা তোমার নিন্দা করেছিল, তারই বদলে আমি এগুলো লিপিবদ্ধ করেছি।' অপর এক বান্দার সামনে কিয়ামতের দিন তার আমলনামা খুলে দেয়া হবে। সে বলবে, হে প্রভু! আমি কি অমুক দিন অমুক পুণ্য করিনি? তখন তাকে বলা হবে, 'তুমি লোকদের নিন্দা করতে। ফলে সে-সব পুণ্য তোমার আমলনামা হতে মুছে ফেলা হয়েছে।'

গীবত থেকে বাঁচার জন্য আজ শুধু এতটুকু জেনে নিই গীবত ও পরনিন্দার শাস্তি কত কঠিন!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: মে'রাজের সময় আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, যাদের ছিল তামার নখ। সেই নখ দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা এবং বুক ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি বললাম, জিবরীল! এরা কারা? উত্তরে তিনি বললেন, যারা (দুনিয়াতে) মানুষের গোশত খেত (গীবত করত) এবং মানুষের সম্মান হানি করত।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে এ স্বভাবের নিন্দা করে বলেন,

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ.

অর্থ: দুর্ভোগ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির, যে পেছনে ও সামনে মানুষের নিন্দা করে।

(সূরা হুমাযাহ:১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

অর্থ: হে মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

(সূরা হুজরাত:১২)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ হতে গীবতের ভয়াবহতা উপলব্ধি করা যায়।

গীবত থেকে বাচতে করণীয়:

> গীবত থেকে বেঁচে থাকতে, কোন মজলিসে অন্য কারো সম্পর্কে আলাপ না করে, নিজের সম্পর্কে বা কোনো কল্যানমূলক কাজের আলাপ করুন। কুরআন হাদীসের শিক্ষা নিয়ে আলাপ করার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকুন।

> যত কম কথা বলা হবে, ততই গীবত করা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তাছাড়া, চুপ থাকাটাও এক ধরনের ইবাদত। এজন্যই বলা হয়-কম ঘুমাও. কম খাও, কম কথা বলো। বেশি কথা বলা গীবতের দরজা তো খুলেই, পাশাপাশি নিজের বিপদও টেনে আনে।

> গীবতের পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখুন, তাহলে আখেরাতের ভয়াবহতা ও দুনিয়ায় লাঞ্চিত হওয়ার ভয়ে নিজেকে গীবত থেকে সংযত রাখা যাবে।

> সবসময় নিজের দোষ-ত্রুটি নিয়ে ভাবুন। কেননা, নিজের ত্রুটির কথা স্মরণ থাকলে, অন্যের চেয়ে নিজেকেই ছোট মনে হবে এবং অন্যের সমালোচনা করার কথা মাথায়ও আসবে না।

> নবী রাসূলদের জীবনী পড়ন। এতে দুনিয়ার জীবনের লোভ-লালসা, হিংসা, রাগ থেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার আগ্রহ আসবে ইন শা আল্লাহ।

> আখেরাতের জীবন ও দুনিয়ার জীবন নিয়ে তুলনামূলক জ্ঞান অর্জন করুন। এর ফলে আখেরাতের জীবনে প্রাধান্য আসবে। সেই সুবাদে গীবত নামক ব্যাধি থেকেও সতর্ক থাকা যাবে।

> বেশি বেশি রবের কাছেই দু'আ করুন, যেনো আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমাকে এই ব্যাধি থেকে নিরাপদ রাখেন!

ঘ. লোভ:

নফসের আরেকটি ব্যাধি হচ্ছে লোভ। লোভ মানুষকে একদম অধঃপতনের অতল গহবরে নিমজ্জিত করে। একজন লোভী মানুষ কখনো সুখী হতে পারে না। সুখের সমস্ত দ্বার, লোভ নামক ব্যাধি পরিপূর্ণভাবে রুদ্ধ করে দেয়, তার জীবন থেকে সুখ কেড়ে নেয়। শুধু তাই নয়, আল্লাহ তাআলা যে-সকল নেয়ামত তাকে দান করেছেন, তার শুকরিয়া তো কখনো আদায় করেই না; উল্টো আল্লাহ তাআলা তাকে যা দান করেছেন, তার চেয়ে বেশি কিছ আকাঙ্ক্ষা করে। এমনকি, যদি সেটা পূর্ণ হয়ে যায়, তখন সে আবার নতুন করে ভিন্ন কিছু চাইতে থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ: একজন ব্যক্তি পায়ে হেঁটে দৈনিক তার কর্মস্থলে যায়। যাওয়ার পথে তার দৃষ্টিগোচর হয়-অনেকেই সাইকেল ব্যবহার করে তব কর্মস্থলে যাচ্ছে। যখন সে এটা দেখে, তখন মনে মনে সাইকেল আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে। বলতে থাকে- 'অবশ্যই আমার একটা সাইকেল চাই। এটা পাওয়ার জন্য যা কিছু করতে হয়, আমি তাই করবো।' এখান থেকেই তার লোভের যাত্রা শুরু। সে পায়ে হেঁটে তার কর্মস্থলে যেতে পারে এটাই তো অনেক কিছু। এরকম অনেক মানুষ রয়েছে, যারা হাঁটতে পারে না; যাদের পা নেই। এদিকে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পা দিয়েছেন, সেই পায়ে হোঁট হেঁটে তার গন্তব্যস্থলে যেতে পারছে।

এতদ্বসত্ত্বেও, তার রবের শুকরিয়া জ্ঞাপন না করে, আরো বড় কিছু আকাঙ্ক্ষা করে বসলো। সাইকেল কেনার জন্য যা যা করা লাগে, সে তাই তাই করল। যখন সে সাইকেল কিনলো, তখন সে বাইক দেখে সেটার দিকে মনোনিবেশ করল। এবার সে মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো, এবার সাইকেল রেখে বাইকে করে কর্মস্থলে যাবে।'

অতঃপর সে বাইকও ক্রয় করে। এভাবে দিন দিন তার লোভের মাত্রা বাড়তেই থাকে। একটার পর একটা চাইতেই থাকে। যা আছে তার কখনো শুকরিয়া আদায় করে না। লোভ করতে করতে এক পর্যায়ে তার আকাঙ্ক্ষা তার সামর্থের বাইরে চলে যায়। তার আকাঙ্ক্ষা আকাশচুম্বী; কিন্তু তাঁর সামর্থ্য শেকলবন্দি। এমতাবস্থায় যখন সে তার সামর্থ্য দ্বারা তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করাতে পারে না, তখন সে অসামাজিক কাজে আত্মনিয়োগ করে। অর্থের জন্য, হারাম পথ বেছে নেয়। যা তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টাই ধ্বংস করে।

এভাবেই চলতে থাকে জীবন; চলতে থাকে তার লোভের চক্র। লোভ যখন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায়, তখন এই লোভের চক্র থেকে বের হয়ে আসা, তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে যায়। ফলে, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে থেকেও সে আকাঙ্ক্ষা করে; আমার মৃত্যুটা যেনো জাকজমকপূর্ণ হয়, মৃত্যুর সংবাদে যেনো মানুষের ঢল নেমে আসে; জানাযা যেন লাখো মানুষের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়।

লাভী ব্যক্তি ধন-সম্পদ অর্জন করে ক্রয় করে: নফসের কষ্ট, ব্যস্ত অন্তর, পরকালের শক্ত হিসাব। আর একজন শুকর গুজারি দারিদ্র ব্যক্তি ক্রয় করে: নফসের শান্তি, মুক্ত স্বাধীন অন্তর, পরকালের সহজ হিসাব।

অসংখ্য রেওয়ায়েত লোভের নিন্দায় বর্ণিত হয়েছে। যার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল,

আনাস ইবনু মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যদি বনি আদমের স্বর্ণ ভরা একটা উপত্যকা থাকে, তথাপি সে তার জন্য দু'টি উপত্যকা হওয়ার কামনা করবে। তার মুখ মাটি ব্যতীত অন্য কিছুতেই ভরবে না। তবে যে ব্যক্তি তাওবাহ করবে, আল্লাহ্ তার তাওবাহ কবুল করবেন।(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৪৩৯)

ইমাম সাদিক রহি. বলেছেন: 'লোভী দু'টি উৎকৃষ্ট গুণ হতে বঞ্চিত, ফলশ্রুতিতে সে দু'টি দোষের অধিকারী: সে পরিতৃপ্ত হওয়া থেকে বঞ্চি ফলে প্রশান্তিকে হাতছাড়া করেছে, আর] সন্তুষ্টি হতে বঞ্চিত ফলে বিশ্বাসকে খুইয়েছে'।

ইমাম আলী রহি. বলেছেন: 'সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা ধনি যে লোভের বন্দি নয়'।

ইমাম সাদিক রহি. বলেছেন: আমিরুল মু'মিনীন বলতেন যে, হে আদমের সন্তানেরা! 'যদি তুমি দুনিয়া হতে পরিমাণ মতো চাও, তাহলে সেটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যদি পরিমাণের চেয়ে বেশী চাও, সমস্ত দুনিয়াও তোমার জন্য যথেষ্ঠ নয়'।

প্রয়োজনের বেশি ধারণ ক্ষমতার বাইরে মানুষ খেতে পারে না, পড়তে পারে না, করতে পারে না-এসব জানা সত্ত্বেও মানুষ অতিরিক্ত পাওয়ার নেশায় কত রকম ধান্দার পেছনে যে জীবন নষ্ট করে দেয়, তা আমাদের চারপাশের মানুষজনকে দেখলেই বোঝা যায়।

লোভ-লালসা হচ্ছে মানুষের হীনতম বৈশিষ্ট্যের একটি। ভাই-বোনের মধ্যে ধন-সম্পদ নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ, সম্পর্ক নষ্ট। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ এবং পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে মামলা-মোকাদ্দমা ইত্যাদি, এ-সবকিছু লোভের-ই ফসল।তাই আত্মশুদ্ধি অর্জনে লোভ বর্জন করা একটি অত্যাবশ্যকীয় কাজ।

ঙ. হিংসা

নফসের রোগসমূহের মাঝে অন্যতম একটি রোগ হচ্ছে হিংসা। হিংসা, নফসের এক অনন্য ব্যাধি। হিংসুক, হিংসার কারণে ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকে। কারো কোনো গুণ তার সহ্য হয় না। এজন্য, কারো ভালো কিছু দেখলেই তার শত্রুতে পরিণত হয়। শত্রুতা করাই তার কাজ। হিংসা এমন এক রোগ, যা সুস্থ মানুষের মন বিগড়ে দিতে দেরি করে না। গীবতের প্রভাবে তার মধ্যে বিবেক বলতে কিছুই থাকেনা। হিংসা আজ মহামারি আকার ধারণ করেছে। সমাজে কেউ কারো উন্নতি সহ্য করতে পারে না। অন্যের উন্নতি দেখে হিংসার আগুনে জ্বলে ছারখার হয়ে যায় তার বিক্ষিপ্ত অন্তর।

এই হিংসা'র গল্পটা মানব সৃষ্টির শুরু লগ্ন থেকেই। যেমন: আদম আ.-কে সৃষ্টি করার পর ইবলিস যখন আদম আ.-এর গুণ দেখতে পেল, তখনই সে তার শত্রু হয়ে গেল। হিংসা

থেকেই সে বলল, আনা খাইরুম মিনহু। আমি তার চেয়ে উত্তম। আবার ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরাও হিংসা করেছিল, তার উপর। ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা যখন দেখল, ইউসুফ তাদের পিতার কাছে প্রিয় সন্তান, তখনই তারা হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। অবশেষে তারা হিংসার আগুনে জ্বলে ইউসুফ আ.-কে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। যেন, তাদের পিতা শুধুমাত্র তাদের দিকেই দৃষ্টি নিবিষ্ট করেন।

হিংসা প্রত্যেকের ভেতরেই রয়েছে। হিংসা ছাড়া কোনো মানুষ নেই। কারো ভিতরে কম, কারো ভিতরে বেশি। তবে, প্রকৃত মুসলিম, প্রকৃত দীনদার, কখনো হিংসাকে প্রশ্রয় দেয় না। তাই আমাদের উচিত নিজের হিংসার সত্তাকে সংযত রাখা। আর, অন্য কেউ যদি আপনার আমার ওপর হিংসা কবে। আপনার উন্নতিতে আপনার সফলতায় তার জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে যায়, তখন ঘাবড়ে যাবেন না। লোকেরা আপনাকে হিংসা করবে এটাই স্বাভাবিক। এ নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তার কিছু নেই, বরং কেউ হিংসা করলে আপনার খুশি হওয়া উচিত। কেননা, যে কারণে আপনি হিংসুকের হিংসার পাত্র হয়েছেন, সেই কাজে আপনি পারদর্শী। মোটকথা, হিংসুকের হিংসা আপনার দক্ষতার পরিচায়ক। মনে রাখবেন-যার মধ্যে যে গুণের শূন্যতা, সে-ই উক্ত গুন সম্পন্ন ব্যক্তিকে সহ্য করতে পারে না। যার মধ্যে যে গুণের অভাব, সে গুনের অভাবেই সে হিংসার আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। মনে রাখবেন-কোনো এক প্রহর হিংসুকের হিংসা থেকে মুক্ত থাকা আপনার জন্য দুঃসংবাদ। কেননা, নিকৃষ্ট মানুষকে কেউ হিংসা করে না; হিংসা তো করে সর্ব গুণে গুণান্বিত কোনো এক সফল ব্যক্তির।

এজন্য সবার জন্য উচিত, হিংসা না করে নিজেকে এমন ভাবে গড়ে তোলা, যেন অন্যরা সবাই আপনাকে হিংসা করতে পারে। হিংসুটে না হয়ে হিংসার পাত্র হওয়ার চেষ্টা করুন। নফস আপনাকে হিংসুটে বানাতে চায়; হিংসার পাত্র নয়। এজন্য, নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করে হিংসুটে না হয়ে, হিংসার পাত্র হতে হবে।

এবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন-আমাদের মধ্যে এই শিক্ষাগুলো কতটুকু আছে? অন্যের দিকে না তাকিয়ে প্রত্যেকে যার যার অবস্থা যাচাই করুন। আমরা আজকাল সবাই কি একটু বেশিই হিংসুটে হয়ে যাচ্ছি না? এমন হিংসুটে ভাব কেন? অন্যের ভালোটা সইতে এত কষ্ট হয় কেন? তার কারণ হচ্ছে-আমরা আজ নফসের কাছে পরাজিত। আজ নফসের দাসত্বে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছি। সাথে সাথে ঈমানের মূল মর্ম আমরা হারিয়ে ফেলেছি। মগজহীন খোসা নিয়ে বেঁচে আছি আমরা। অথচ, ঈমান নিয়ে কবরে যেতে হলে আমাদের স্বভাব পাল্টাতে হবে। বদলাতে হবে নিজেদেরকে। গুণীর গুণের স্বীকৃতি দেয়া শিখতে হবে।

কারো ভালো কিছু দেখে কষ্ট হলে কষ্ট ভেতরেই রাখতে হবে। বাইরে যেন প্রকাশ না পায়। ভেতরে ভেতরে কিছুক্ষণ জ্বলবো। একসময় ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মনে রাখবেন-লোভ, হিংসা, অহংকার ধ্বংসের মূল। হিংসা, সর্বপ্রকার উন্নতির অন্তরায়। যে অন্যকে হিংসা করে, সে মনের শান্তি পায় না। হিংসা আত্মার রোগ।

হিংসা অন্যের দিকে লক্ষ্য করে এবং আঘাত করে। এতে করে নিজের মনুষ্যত্ব হারিয়ে যায়। আপনি একই সাথে হিংসুক ও সুখী হতে পারবেন না। কেননা, হিংসা সুখী জীবনের অন্তরায়। হিংসা ও প্রশান্তি কখনই একসাথে থাকতে পারে না। কেননা, হিংসা প্রজ্জ্বলিত আগুনের ন্যায়-যা সর্বদাই তাকে পোড়াতে থাকে।

তাই, আমাদের উচিত সর্বদা হিংসামুক্ত জীবন লালন করা। হিংসাকে দূর করে আত্মশুদ্ধি উন্নয়নের দরজা খুলে দেয়া।

চ. অলসতা:

নফসের আরেকটি ব্যাধি হচ্ছে, অলসতা। নফস হচ্ছে আরাম প্রিয়সী।নফস সব সময় আরাম চায়। এই নফস অলসতাকে কাজে লাগিয়ে আজ আপনাকে আমাকে সর্বপ্রকার ইবাদত থেকে দূরে রাখছে। অলস নফস ফজরের ওয়াক্তে ঘুমিয়ে আরাম পেতে চায়। রমজান মাসে গরম দূর করতে কোল্ড-ড্রিংকস্ খেয়ে আরাম পেতে চায়। এই অলসতা ইবাদত-বন্দেগির প্রতিবন্ধকতা। যার মধ্যে যত বেশি আলসেমি, তার ইবাদতে ততবেশি ঘাটতি। অলসতার দরুণ, আজ অনেকেই ফজরের নামাজ কাজা করে। অলসতায় বশীভূত হয়ে জামাত তরক করে। অলস ব্যক্তি কখনে সফলতার মুখ দেখতে পায় না। অলস ব্যক্তি ইহকালীন-পরকালীন উভজগতেই ব্যর্থ। না দুনিয়াতে কিছু করতে পারে; আর না আখেরাতের জন কিছু করতে পারে!

অলসতার কারণ:

একজন মানুষ কেন অলস হয়? কেন তাকে অলসতায় গ্রাস করে নেয়? একজন মানুষ অলস হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে...

১ অলস হওয়ার পেছনে দায়ী হচ্ছে, আমাদের বাবা-মা কিংবা পরিবার। ছোটবেলা থেকেই এমন আদুরে পরিবেশে বাচ্চাদের লালন-পালন করা হয়, যার কারণে পরবর্তীতে সে আর আদুরে পরিবেশ থেকে বের হতে চায় না। ছেলে যদি হাটতে চায়, মা বলে, "বাবা, মাটিতে হেঁটো না, পিপড়া কামড়াবে; ওভাবে দৌড়িও না, ব্যাথা পাবে।" বাচ্চা যখন এমনি এমনি আবেগপ্রবণ হয়ে নামাজ পড়তে চায়, তখন বাবা বলে, "বাবা, তুমি এখনো ছোট। ঘুম থেকে ওঠার দরকার নেই; বরং ঘুমিয়েই থাকো। কী দরকার ঘুম থেকে ওঠার? কী দরকার এই ছোট বয়সে এতো কষ্ট করার?" মা-বাবার ভুল প্যারেন্টিং-এর এমন বহু উদাহরণ রয়েছে।

২. অলসতার আরেকটি কারণ হচ্ছে, সিদ্ধান্তে অটল না থাকা। আমরা হয়তো মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই, আগামীকাল থেকে আর দেরিতে ঘুম থেকে উঠবো না। এখন থেকে প্রতিদিন ফজরের আযানের সাথে সাথে ঘুম থেকে উঠবো। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই ঠিকই, কিন্তু সেটা আর বাস্তবায়ন করি না। অলসতাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রতিদিন নাক ডেকে ঘুমিয়ে থাকি। ফলে, অলসতা ধীরে ধীরে আমাদের ওপর আরো বেশি ভর করে নেয়।

৩. অলসতার আরেকটি কারণ হচ্ছে অজ্ঞতা। অজ্ঞতার জন্যও অবশ্য অলসতাই দায়ী। মানুষ যখন কোন কর্মের ফলাফল সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তখন সে ওই কাজ করার জন্য ভালোভাবে প্রচেষ্টা চালাতে চায় না। যেমন: ভিক্ষুক জানে না-পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জনে কত শান্তি নিহিত রয়েছে। এখানে অবশ্য, সে ভিক্ষক হওয়ার জন্য তার অজ্ঞতা এবং অলসতা দু'টোই দায়ী।

অলসতা দূর করার উপায়:

১. শুরুটা সহজ কিছু দিয়ে হোক:

এক বছরে ১০০ বই পড়ার ইচ্ছে। এদিকে ১০০ বইয়ের নাম শুনেই ভয়ে কুপোকাত। ফলে শুরুটা আর হচ্ছে না। কাঠিন্যতার ভয় দেখিয়ে অলসতা সেখানে জায়গা করে নিচ্ছে। শুরুতেই কঠিন কিছুকে অভ্যাস হিসেবে তৈরি করা বেশ কঠিন। তাই, শুরু করুন সহজ কিছু দিয়ে। নিজের ওপর চাপ না হয় এমন কিছু দিয়ে। যেমন: প্রথম মাসে একটি বই, দ্বিতীয় মাসে দু'টি বই, তৃতীয় মাসে ৫ টি বই-এভাবে ক্রমাগতভাবে মাস অনুযায়ী বাড়াতে থাকবেন। তাহলে এটা খুব সহজেই আপনার মস্তিষ্ক কেচ করবে। অন্যথায়, চাপ মনে করে অলসতা বাসা বাঁধবে।

নেক কাজ, ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রেও এমনটাই করুন। নফল নামাজের ক্ষেত্রে প্রথমদিন দু'রাকাত দ্বিতীয় দিন চার রাকাত তৃতীয় দিন ছ' রকাত-এভাবে শুরুটা সহজভাবে করে ধীরে ধীরে বাড়াতে থাকুন। কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রথম দিন দুই পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় দিন চার পৃষ্ঠা, তৃতীয় দিন ছয় পৃষ্ঠা-এভাবে ধীরে ধীরে বাড়াতে থাকুন। প্রথম দিনে যদি ১০০ রাকাত নফল নামাজ পড়ার এবং পাঁচ পারা কুর'আন তেলাওয়াত করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে সেটা শুরু করতে অলসতার বাধা আসবে। তাই, শুরুটা স্বাভাবিকভাবে সহজ ভাবে করুন।

২. কাজের গুরুত্ব, প্রয়োজন ও ফলাফল কী হবে, সেটা মাথায় রাখা:

ব্যক্তিজীবন ও কর্মক্ষেত্রে কোনো কাজের গুরুত্ব কেমন তা বুঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। কাজের প্রকৃতিকে যদি গুরুত্ব ও প্রয়োজন বুঝে কাজ ভাগ করতে পারেন, তাহলে সহজেই অলসতা কাটানো যায়। যেমন: "আপনার কাছে এমন একটি কাজ আসলো, যা করলে আপনি কিছু অর্থ পাবেন। আর ওই অর্থের দিকে আপনার পুরো পরিবার তাকিয়ে আছে।" এটা ভাবলে ওই কাজের গুরুত্ব আপনার বুঝে আসবে এবং এর ফলাফল কী, সেটাও বুঝে আসবে। ঠিক ইবাদতের ক্ষেত্রেও ইবাদতের গুরুত্ব এবং তা আদায় করার পর কী ফলাফল আসবে-তা নিয়ে ভাবুন। যখন শরীয়তের বিধি-বিধান এর গুরুত্ব সম্পর্কে জানবেন তা সম্পাদনে আগ্রহী হবেন। অতঃপর যখন এর ফলাফল তথা জান্নাত লাভের কথা ভাববেন, তখন অলসতার দরজা এমনিতেই তালাবদ্ধ হয়ে যাবে।

৩. নিয়মে অভ্যস্ত হোন:

কাল সকাল থেকে নিজেকে বদলে ফেলবো। কাল থেকে আর নামাজ ত্যাগ করব না-এমন করে কতই না অনুপ্রেরণা দিই, কতই না প্রতিজ্ঞা করি। কিন্তু সময় আসলে সেটা আর বাস্তবায়ন করি না। নিজেকে বদলে ফেলব বলে সিদ্ধান্ত নিই, কিন্তু বদলানোর জন্য চেষ্টা করি না। নিয়মিত নামাজ পড়বো, নামাজ ছাড়বো না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই কিন্তু নামাজের সময় আসলে সেটা আর মাথায় থাকে না। অনেক সময় শুরুটা করি ঠিক কিন্তু সেটা আর নিয়ম তান্ত্রিক হয় না।

৪. সময়ের কাজ সময়ে শেষ করুন:

আজকে সারাদিন কী কী কাজ করবেন, কী কী আমল করবেন-তা ছোট একটি কাগজে লিখে নিন। অতঃপর, নোট করা সেই কাজগুলো সে দিনেই সম্পন্ন করুন। আগামীকালের জন্য ফেলে রাখবেন না। আগামীকালের জন্য ফেলে রাখলেই তা জমা হয়ে যায়। আর জমা কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে অলসতার বাধা আসে।

৫. বই পড়ুন:

বই পড়ার মতন আনন্দ আর কোনো কাজে নেই। ইসলামিক আত্মউন্নয়নমূলক, আত্মশুদ্ধি মূলক বই পড়ুন। বই পড়ার মাধ্যমে প্রকৃত অর্থেই আপনার আত্ম-উন্নতি ঘটবে। তাই ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অলসতা দূর করতে বই পড়ার অভ্যাস অত্যন্ত সহায়ক।

৬. কল্পনা করুন:

সকালে উঠে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন, আপনি ভবিষ্যতে ঠিক কীভাবে নিজেকে দেখতে চান। আপনার সাফল্যের চিত্রটি ঠিক কীরকম হবে? সেই বিষয়ে কল্পনা করুন।

তাই অলসতা দূরীকরণে আমরা উপরোক্ত নীতিমালা মেনে চলার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জনের পথে এগিয়ে যাবো ইন শা আল্লাহ্।

ছ. আসক্তি:

টাকার নেশা:

টাকা উপার্জন করা আমাদের দায়িত্ব। টাকা ছাড়া চলার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সুন্দরভাবে জীবনটাকে পরিচালনা করার জন্য, চাওয়া-পাওয়া গুলো বাস্তব রুপ দেয়ার জন্য টাকার প্রয়োজন। টাকা উপার্জন করা ভালো; তবে টাকার' নেশায় মত্ত হয়ে জীবনের অর্থ ভুলে যাওয়া খুবই ক্ষতিকর। যারা টাকার
নেশায় ডুবে গেছে, তারা তো নিজের মধ্যে নিজেই হারিয়ে গেছে। টাকার নেশায় মত্ত হয়ে, নিজের কাছে নিজেকেই বিক্রি করেছে; সুখ নামক শব্দটা জীবনের ডায়েরীর পাতা থেকে

মুছে ফেলেছে। অনেকেই বলে, টাকার মধ্যে সকল সুখ নিহিত, আর একজন মুমিন বলে, প্রয়োজনের অতিরিক্তের মধ্যেই সকল অশান্তি লুকায়িত। তারা টাকা দিয়ে সুখ কিনতে চায়: আর একজন মুমিন রবের হুকুম মেনে সুখি হতে চায়।

একজন প্রকৃত মুমিন টাকা উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহের জন্য। তবে, সে টাকার নেশায় ডুবে যায় না। ইতিপর্বে যারাই টাকার নেশায় আসক্ত হয়েছে, তারাই ধ্বংস হয়েছে। টাকার নেশায় আসক্ত ব্যক্তি সবসময় টাকার পিছনেই ছুটে। আপনি দেখবেন একজন ব্যক্তির অগাধ ধন-সম্পদ রয়েছে, কোটি কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স। এতদসত্ত্বেও, সে শুধু সারাদিন টাকার পিছনেই ছুটে, কীভাবে আরো টাকা লাভ করা যায়, সেই চিন্তায় সর্বদাই বিভোর।

টাকার পেছনে ছুটতে গিয়ে, পুরো পরিবারের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। সন্তানকে মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। স্ত্রীর প্রতি অবহেলা তৈরি হয়। ফলে, স্ত্রী যদি দীনদার না হয়, তখন পরকীয়ার জগতে পা বাড়ায়। টাকার নেশায় যারা আসক্ত, তারা খুন-খারাবি করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। টাকার জের ধরে কত হানাহানি, কত খুনাখুনি। টাকার নেশায় আসক্ত ব্যক্তিরা অধিকাংশ সময়ই মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জেলে কাটাতে হয়। কেননা, তারা টাকার জন্য যে-কোনো অমানবিক, জঘন্য কাজও বেছে নেয়।

নারীর নেশা:

নারীর নেশাও আমাদের জন্য খুবই ভয়ংকর। যারা নারীদের নেশায় আসক্ত, তারা সব সময় শুধু নারীদের পেছনেই ছোটে। কীভাবে তাদেরকে কাছে পাওয়া যায়, কীভাবে তাদের সাথে সম্পর্কে জড়ানো যায়-সেই চিন্তায় সর্বদাই বিভোর। নারীর নেশা চারিত্রিক অবক্ষয় নষ্ট করে। চরিত্রে কালো দাগ এটে দেয়। যারাই নারীদের নেশায় আসক্ত হয়েছে, তারাই ধ্বংস হয়েছে-পরিবার, আত্মীয়-স্বজন সবার কাছে অপ্রিয় হয়ে, ঘুরে বেড়াতে হয়েছে উদভ্রান্তের ন্যায়।

পতিতালয় গমনের নেশা:

যারা নিজের নফসের ওপর লাগাম দিতে পারে না, তাদের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সারাক্ষণ নফসের গোলামী করে যৌন লালসা নিজের মধ্যে পোষণ করে রাখে-তারাই পতিতালয়ের নিয়মিত কাস্টমার। আর একজন ব্যক্তি যখন পতিতালয়ের কাস্টমার হয়ে যায়,

তখন সে আর এটা থেকে বের হয়ে আসতে চায় না। বিয়ের পরেও এই নেশার কাটিয়ে উঠতে পারে না, যতক্ষণ না নিজের নফসের ওপর লাগাম টেনে ধরছে।

পর্ণ গ্রাফিক্সের নেশা:

পর্ন গ্রাফিক্স যুবকদের জন্য কতটা ভয়াবহ, তা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। শুধু এতোটুকুই জেনে রাখুন-জীবন-যৌবন সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে।

হস্তমৈথুনের নেশা:

এটাতো আরো মারাত্মক নেশা। একবার যে নেশায় নেশাগ্রস্ত হয়েছে, সে জানে তার জীবনে কী চলছে! বার বার নফস তাকে ধোঁকা দিয়ে বলে,' এটাই ফার্স্ট এটাই লাস্ট'!

এছাড়াও অনেক নেশা রয়েছে যাতে আমাদের আসক্তি তৈরি হয়। আর এই আসক্তি মূলত নফসের এক ব্যাধি।এই ব্যাধি থেকে নিজেদের মুক্ত না করলে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা সম্ভব না।

তাওহীদ আত্মশুদ্ধির প্রধান হাতিয়ার:

দ্বীনে ইসলামে প্রবেশ করার জন্য একজন মানুষের ওপর প্রথম ওয়াজিব হচ্ছে তাওহীদ। আর দাঈ ইলাল্লাহদের জন্যও প্রথম ওয়াজিব হচ্ছে, তাঁরা মানুষকে সর্বপ্রথম তাওহীদ শেখাবে, যেমনটা নবীজী(সা:) মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) -কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বলেছিলেন,

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ
أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى

“তুমি আহলে কিতাব এক জাতির নিকট যাচ্ছ। কাজেই প্রথমেই তাদের এই দাওয়াত দেবে যে তারা যেন আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে। (তাদের তাওহীদের দাওয়াত দেবে)।”

যারা নিজেদের তাওহীদ ও ঈমানের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করবে না, তাদের আল্লাহ কিয়ামাতের দিন প্রচণ্ড আযাবের হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

(وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧

"দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য, যারা যাকাত দেয় না এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।”

এই আয়াতের তাফসিরে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহি:) বলেছেন,
"এখানে 'الزَّكَاةَ' দ্বারা এমন তাওহীদ ও ঈমান বোঝানো হয়েছে, যা অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। কেননা, তা অন্তরের ওপর (ঈমান ও তাওহীদের) হক ব্যতীত অন কিছুর প্রভুত্ব অস্বীকার করে এবং হকের প্রভুত্বকে মেনে নেয়। এটাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর হাকীকত। এটাই আত্মশুদ্ধির মূল ভিত্তি।”

তাওহীদ যেমন অন্তরের শুদ্ধি ও পবিত্রতার মূল, ঠিক তেমনি তাঁর বিপরীতে শিরক অন্তরকে সবচেয়ে বেশি দূষিত ও ধ্বংস করে; বরং তা তো সকল আমলকেই নিষ্ফল করে দেয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে, 'আপনি আল্লাহর সাথে শিরক করলে আপনার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন'।"

শিরক এমন মারাত্মক গুনাহ যে, এতে লিপ্ত থেকে যে মারা যাবে, আল্লাহ তাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না। তিনি বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

"আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না। এটা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করেন।"

যে আল্লাহর সাথে শিরক করে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

"কেউ আল্লাহর সাথে শিরক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।"

যখন বান্দা তাওহীদকে বিশুদ্ধভাবে অর্জন করে নেয়, তখন সে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়। আর দুনিয়া ও আখিরাতে পরিপূর্ণ হিদায়াত ও নিরাপত্তা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলম দ্বারা মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।"

কাজেই বান্দা যখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য বিনয় ও ভালোবাসা লালন করে, তখন তার আমল খালিস (শুধু আল্লাহর জন্য) হয়। সঠিক হয়। তার অন্তর পরিশুদ্ধ ও প্রফুল্ল হয়। অন্যদিকে বান্দা যখন তার অন্তরে শিরকের বিষাক্ত উপসর্গ ঢেলে দেয়, তখন তার অন্তর যথারীতি কলুষিত ও মলিন হয়ে পড়ে।

সুতরাং তাওহীদ ঠিক করা, আল্লাহকে ইবাদাতের জন্য একক সত্তা হিসেবে গ্রহণ করা এবং খালিসভাবে তাঁরই জন্য আমল করা ব্যতীত আত্মশুদ্ধি অর্জিত হবে না। আল্লাহ বলেন,

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

"জেনে রাখো, অবিমিশ্রিত আনুগত্য কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য।"

আত্মশুদ্ধি অর্জনে সালাতের ভূমিকা:

সালাত নাফসকে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। সেই সাথে সমস্ত কল্যাণ ও পরিপূর্ণতা এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও ভালোবাসা সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হলো এই সালাত। সালাত হলো সমস্ত ইবাদতের মূল। ঈমানের পরই সালাতের কথা বলা হয়েছে। এই সালাতেই মুসলিম আর বিধর্মীদের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে। সালায় একটি ফরজ বিধান। যা আমাদের উপর অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে সালাতের ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে প্রায় ৮০ জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে।রাসুল(সা:) ও বহু হাদিসে সালাতের ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন।

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ

“ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মধ্যকার পার্থক্যের সূচক হলো সালাত বর্জন। "

অপর আরেকটি হাদীসে রয়েছে...

যে ব্যক্তি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যত্নের সাথে আদায় করবে, কেয়ামতের সময় এ সালাত তার জন্য আলো হবে, তার ঈমান ও ইসলামের দলিল হবে এবং তার নাজাতের ওসিলা হবে। আর যে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়মিত সালাত আদায় করবে না, কেয়ামতের বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে সালাত তার জন্য আলো হবে না, দলিল হবে না এবং সে আযাব ও শাস্তি থেকে রেহাইও পাবে না।

সালাতে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক- দু'টি দিক রয়েছে। বাহ্যিক দিকের সৌন্দর্য ছাড়াও এর অন্তর্নিহিত চেতনার রয়েছে অশেষ প্রভাব। বস্তুতপক্ষে সালাত পবিত্র অন্তরের প্রাণশক্তি, সজীবতা ও প্রশান্তির উৎস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, جُعِلَتْ. قُرَّةُ عَيْنِى فِي الصَّلاة - "সালাতের মধ্যেই আমার চোখের শীতলতা অর্থাৎ শান্তি রাখা হয়েছে। " কাজেই পার্থিব জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে আবদ্ধ এবং বস্তুগত চাহিদা মেটাতে ক্লান্ত ও শ্রান্ত মানুষের জীবনে সালাত যেন আধ্যাত্মিকতার বিশুদ্ধ বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলার ও সজীবতা অর্জনের এক মুক্ত প্রাঙ্গণ। এ যেন এমন এক স্রোতধারায় অবগাহন, যা ধুয়ে মুছে ফেলে মনের সমস্ত কালিমা ও বস্তুগত গ্লানি। এ কারণেই ইসলামে সালাত কায়িম করার ওপর এতো বেশি জোর দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পবিত্র কোরআনে সমস্যা ও সংকটের সময় সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য

চাইতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاسْتَعِينُوا بالصبر والصلاة

"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো।"

এভাবে সালাত হলো বিপদ-আপদসহ সব সময়ের সহায় এবং অন্তরের সবচেয়ে বড় প্রশান্তির মাধ্যম।

মানুষ অনেক বিষয়ের প্রশিক্ষণ পায় সালাতের মাধ্যমে। সালাতে নাফসকে বিনম্র ও অহঙ্কারমুক্ত করার অনুশীলনের ফলে কুপ্রবৃত্তি জেগে ওঠার সুযোগ পায় না এবং খারাপ অভ্যাসও নামাযীর আচার-আচরণে স্থান পায় না। এভাবে পরিশুদ্ধ হবার পর নামাযী সমাজকেও কল্যাণ ও উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

. إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا .إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا .إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

মানুষকে খুবই অস্থিরচিত্ত দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে বিপদগ্রস্ত হলে হা-হুতাশ করতে থাকে এবং ঐশ্বর্যশালী হলে কৃপণ হয়ে পড়ে, তবে তারা নয়, যারা সালাত আদায় করে, যারা তাদের সালাতে সদা নিষ্ঠাবান।

وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر

আর সালাত কায়িম করো।নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও পাপ থেকে বিরত রাখে

মানুষ যখন সালাত আদায় করে, তখন তার ভেতরের সতর্ককারী বিবেক সজীব বা প্রাণবন্ত হয়। এ বিবেক তাকে বারংবার অশ্লীলতা ও অন্যায়ের ব্যাপারে সতর্ক করতে থাকে। এ বিষয়গুলোর উচ্চারণ ও পুনরাবৃত্তি নাফসকে বিনম্র ও ভীত-সন্ত্রস্ত রাখে। এ জন্য বারবার সালাত আদায়ের বিধান দেয়া হয়েছে। সাওম বছরে একবার, হাজ্জও একবার; কিন্তু সালাত বার বার পড়তে হয়। সালাতের বিশেষ গুরুত্বটা এখানেই। সালাত নিয়মিতভাবে বিনয় ও

মনোযোগসহ পড়া হলে শুধু নামাযীর নাফসই নয়, একই সাথে তার আশপাশের পরিবেশও কোমল, বিনম্র ও সুরভিত হয়।

সালাত আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভের প্রধান মাধ্যম। এর সাহায্যে একজন মু'মিন অন্তত দিনে পাঁচবার আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হবার এবং তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ পায়। এ কারণে সালাতকে معراج المؤمن (মু'মিনের মি'রাজ) বলা হয়। এতে বান্দা তার প্রতিটি অবস্থায় যিকর ও দু'আর মাধ্যমে প্রকারান্তরে আল্লাহ তা'আলার সাথে গোপন আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়। হাদীসে কুদসীতে সূরা ফাতিহা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যখন বান্দা সূরা ফাতিহা পাঠ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি কথার উত্তর দিয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ). قَالَ اللهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .(قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي .وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ .(قَالَ مَحْدَنِي عَبْدِي فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ .(قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ .فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .(قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

'সালাত (অর্থাৎ সূরাতুল ফাতিহা) কে আমি আমার এবং আমার বান্দাহর মধ্যে দুভাগে বিভক্ত করেছি। অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা যা চায়, তা তাকে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন বান্দাহ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ বলে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করেছে। আর যখন الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ বলে, তখন তিনি বলেন যে, আমার বান্দাহ আমার গুণগান করেছে। আর যখন مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ বলে, তখন তিনি বলেন, আমার বান্দাহ আমার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে। আর যখন نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এটা বলে, তখন তিনি বলেন, এ বিষয়টি আমার এবং আমার বান্দার মধ্যেই রইলো। আর বান্দাহ যা চায়, তা তাকে দেয়া হবে। আর যখন اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বলে, তখন তিনি বলেন, এটা আমার বান্দাহর জন্য রইলো আর আমার বান্দাহ যা চাইবে তা-ই পাবে।

সালাত, সরাসরি আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়। আর যে বাক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায়, তার উপর কখনো নফস কর্তৃত্ব করতে পারে না। যে

ব্যক্তি সালাতের মাধ্যমে তার রব'কে পেয়ে যায়, সে কখনো নফসের গোলামী করতে পারে না; সে তখন শুধুমাত্র রবের দাসত্বেই নিজের ভবিষ্যৎ খুঁজে নেয়। তাই আত্মশুদ্ধি অর্জনে সালাতের কোনো বিকল্প নেই।

আত্মশুদ্ধি অর্জনে যাকাতের ভূমিকা:

'যাকাত' ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি মৌলিক ভিত্তি। ঈমানের পর সালাত, আর সালাতের পরেই যাকাত হচ্ছে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন। 'যাকাত' শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থই হলো- পবিত্রতা, পরিশুদ্ধি, উন্নয়ন সাধন ও বৃদ্ধি লাভ। শারী'আতের পরিভাষায় দরিদ্র ও অভাবীদেরকে ধনীদের বছর শেষে দেয় নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের স্বত্ব অর্পণ করাকে যাকাত বলা হয়।

যাকাত ইসলামের একটি বাধ্যতামূলক অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিধান। কোরআন মাজীদের বত্রিশ জায়গায় যাকাতের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে আটাশ জায়গায় সালাত ও যাকাতের কথা একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো- সালাত যেমন 'ইবাদাত, তেমনি যাকাতও 'ইবাদাত'। সালাত হলো সরাসরি আল্লাহর 'ইবাদাত আর যাকাত হলো জনসেবার মাধ্যমে আল্লাহর 'ইবাদাত'। বস্তুত ইসলামে সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করার কোনো সুযোগই নেই।ইসলামে যাকাত এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, যাকাত অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামের প্রথম খালীফা আবু বকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। খালীফা তাদেরকে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সমতুল্য মনে করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে যারা যাকাত দিতো, তাদের মধ্যে কেউ যদি একটি ছাগলের বাচ্চাও দিতে অস্বীকার করে তবে তার বিরুদ্ধে আমি জিহাদ করবো।তিনি আরো বললেন,

وَاللَّهِ تَأَقَاتِلَنَّ .مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

" আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই করবো। "

যাকাতের অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও আত্মিক বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে।

যাকাতের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি:

লোভ ও কৃপণতা মানুষের নাফসের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ দুটি হচ্ছে নাফসের সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং নিকৃষ্ট স্বভাব, কোরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় জোরালো ভাষায় এ সবের নিন্দা করা হয়েছে। কৃপণ ও লোভী ব্যক্তিরা যাকাত দিতে পারে না। লোভ ও কৃপণতা তাদের অন্তরাত্মাকে সংকীর্ণ এবং সঙ্কুচিত করে দেয়। পক্ষান্তরে যাকাত মানুষের এ অনুদার মনোভাবকে ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করে দেয়, আর তার অন্তরকে করে দেয় সুপ্রশস্ত ও মহান। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তির নফস পরিশুদ্ধ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

-بَرِئَ مِنَ الشُّحُ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى .الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ

"সে ব্যক্তি মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, যে যাকাত আদায় করে, অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করে এবং বিপদাপদে লোকদের সাহায্য করে। "

যে সব ব্যক্তি কৃপণতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে পারবে, তারাই সফলকাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ
- شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"এবং ব্যয় করো। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। "

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

- وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَمْلَكَ .مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

"তোমরা মনের কার্পণ্য থেকে বেঁচে থেকো। কেননা এটাই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করে দিয়েছে।"

যাকাতের চারিত্রিক ফায়দা:

১. যাকাত ব্যক্তিকে দানশীল ও বদান্যদের কাতারে শামিল করে। যখন আপনি দান-সদকায় অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন, তখন নফস ধীরে ধীরে সতেজ হয়ে উঠবে।

২. যাকাত প্রমাণ করে, যাকাত আদায়কারী অভাবীদের প্রতি রহম, দয়া ও অনুগ্রহশীল, আর আল্লাহ দয়াশীলদের উপর দয়া করেন।

৩. মুসলিমদের উপর আর্থিক ও শারীরিক সেবা প্রদান অন্তঃকরণকে প্রশস্ত ও প্রফুল্ল করে এবং মানুষের নিকট যাকাত দাতাকে প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ করে তুলে।

৪. যাকাতে রয়েছে লোভ ও কৃপণতা থেকে মুক্তি।

যাকাতের সামাজিক উপকারিতা:

১. যাকাতের ফলে অভাবীদের অভাব দূর হয়, দুনিয়ার অধিকাংশ জায়গায় যাদের সংখ্যাই বেশী।

২. যাকাতের ফলে মুসলিমদের শক্তি অর্জন হয় ও তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, কারণ যাকাতের একটি খাত জিহাদ।

৩. যাকাত গরীবদের অন্তর থেকে ধনীদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ দূর করে দেয়। কারণ গরীবরা যখন দেখে ধনীরা তাদের সম্পদ দ্বারা যাবতীয় প্রয়োজন পুরো করে, কিন্তু তাদের সম্পদ থেকে তারা কোনভাবে উপকৃত হয় না, এ কারণে অনেক সময় ধনীদের প্রতি তাদের অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষের জন্ম নেয়, যেহেতু ধনীরা তাদের অধিকার রক্ষা করে না, তাদের কোন প্রয়োজনে তারা সাড়া দেয় না। কিন্তু ধনীরা যদি বছর শেষে গরীবদের যাকাত দেয়, তাহলে তাদের অন্তর থেকে এসব বিষয় দূরীভূত হয় এবং উভয় শ্রেণীর মধ্যে মহব্বত ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

৪. যাকাতের ফলে সম্পদ বৃদ্ধি পায় ও তাতে বরকত হয়। যেমন হাদিসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোন সদকা সম্পদ হ্রাস করেনি"।

যাকাত প্রদানে নফস পরিশুদ্ধ হয়।যেমন: অহংকার, হিংসা, লোভ, কৃপণতা অন্তর থেকে দূরীভূত। হয়। ফলে একজন ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয়।

দোআ আত্মশুদ্ধির চাবিকাঠি:

দুআ আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ইবাদাতসমূহের একটি। কেননা, এতে রয়েছে বান্দার অসহায়ত্ব, অভাব, বিনয় ও অপূর্ণতার বহিঃপ্রকাশ। পাশাপাশি আল্লাহর শক্তি-সামর্থ্য, ক্ষমতা, প্রাচুর্য, প্রাচুর্য দানের ক্ষমতা, বড়ত্ব, শত্রুদের ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার অপ্রতিরোধ্য শক্তি এবং ভালোবাসার ব্যক্তি ও বন্ধুগণের মর্যাদা দানের মহত্ত্বের সরল স্বীকারোক্তি।"

নবীজী(সা:) বলেছেন,

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ

"আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত আর কিছু নেই।"

কল্যাণের দুয়ার খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে দুআর বিরাট প্রভাব রয়েছে, যেমনটা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ(রহি:) আবুল কাসিম আল মাগরিবীকে(রহি:) অসিয়ত করার সময় বলেছিলেন, "দুআ হচ্ছে প্রত্যেক কল্যাণের চাবিকাঠি।"

যে আল্লাহর কাছে চায় এবং দুআ কবুলের ব্যাপারে তাঁর ওপর ভরসা করে, আল্লাহ তার দুআ কবুলের ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"তোমাদের রব বলেছেন আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।"

আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব(রা.) বলেছেন, "দুআ কবুল হবে কি না এই দুশ্চিন্তা আমি করি না; বরং আমি কেবল দুআটা করছি কি না সেই দুশ্চিন্তা করি। আমি যদি দুআ করতে পারি, তাহলে কবুল হওয়ার ব্যাপারটাও এর সাথেই নিশ্চিত হয়ে যাবে।"

আত্মশুদ্ধির বিষয়ে নবীজী(সা.) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি দুআয় বলতেন,

اللهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاها

"হে আল্লাহ, আমার নফসকে তাকওয়া দান করুন ও পরিশুদ্ধ করুন,আপনিই তো সর্বোত্তম পরিশুদ্ধকারী। আপনিই তার অভিভাবক ও মাওলা।"

আত্মশুদ্ধি যে আলিমুল গাইব আল্লাহর হাতে রয়েছে সেদিকে এই দুআয় ইশারা করা হয়েছে এবং জোর দেওয়া হয়েছে। আর তার চাবিকাঠি হচ্ছে দুআ ও আল্লাহর কাছে নিজের অভাবের ব্যাপারে ফরিয়াদ জানানো।

এ জন্য নবীজী(সা.) তাঁর অধিকাংশ দুআয় বলতেন,

يَا مُقَلِّبَ القُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

"হে অন্তর পরিবর্তনকারী, আপনি আমার অন্তরকে দ্বীনের ওপর অটল রাখুন।"

কাজেই বান্দা যখন গভীর মনোযোগের সাথে তার প্রয়োজন ও অভাবকে উপস্থাপন করে, দুআ কবুলের ব্যাপারে দৃঢ় আশা পোষণ করে, দুআ কবুলের ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে, দুআ কবুলের উত্তম সময়গুলো দুআর জন্য বেছে নেয়, তখন এই আশা করা যায় যে তার দুআ মোটেও বিফল হবে না।

আল্লাহর হাতেই আত্মশুদ্ধির চাবিকাঠি রয়েছে এটা জানা অত্যন্ত জরুরি, আর এই জানাই আপনাকে দুআয় নিয়োজিত করবে। আর আল্লাহ তো যাকে ইচ্ছা তাকে পরিশুদ্ধ করেন। সকল বিষয়ের হর্তাকর্তা তো তিনিই, তাঁর ইচ্ছাতেই সবকিছু ঘটে।আল্লাহ বলেছেন,

بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ

"বরং আল্লাহ তো যাকে ইচ্ছা পরিশুদ্ধ করেন।"

বারা (রা.)বলেন, নবীজী(সা.) আহযাব(খন্দক) যুদ্ধের দিন মাটি বহন করছিলেন, এমনকি মাটি তাঁর পেট ঢেকে ফেলেছিল অথবা তাঁর পেট ধুলায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। (এ সময়) তিনি বলছিলেন,

وَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

"আল্লাহর কসম, আল্লাহ যদি তাওফিক না দিতেন, তাহলে আমরা হিদায়াত পেতাম না, দান করতাম না আর সালাতও আদায় করতাম না।"

সুতরাং হিদায়াত, ঈমান ও সকল কল্যাণ কেবল আল্লাহর হাতেই রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ(সা.) এই বিষয়টা সাহাবিদের অন্তরে রোপণ করে দিয়েছিলেন। নিয়মিত এই শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাই তো তিনি খুতবায় উঁচু আওয়াজে বলতেন,

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ

"যাকে আল্লাহ হিদায়াত দেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না।"

কাজেই এই নীতিটি আত্মশুদ্ধির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপায়। যে ব্যক্তি এটা জানবে যে নফসের পবিত্রতা, পরিশুদ্ধি ও স্থিরতা পুরোপুরি আল্লাহরই হাতে রয়েছে, সে আল্লাহর দিকেই ফিরে যাবে, আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য, দুনিয়া ও আখিরাতে নাজাত ও সাফল্য পাবার জন্য আশাবাদী ও আকাঙ্ক্ষী হয়ে দুআর মাধ্যমে তাঁর দুয়ারে বারবার করাঘাত করবে।

কুরআনুল কারীম আত্মশুদ্ধির বিশাল পাথেয়:

আত্মশুদ্ধির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে কুরআনুল কারীম। এটা তো আত্মশুদ্ধিরই কিতাব, এর উৎসমুখ, প্রবাহিত ঝরনাধারা এবং ভিত্তিমূল। যে নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করতে চায়, তার উচিত আল্লাহর কিতাবে তা খুঁজে বেড়ানো। আল্লাহ বলেছেন,

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُوْلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত শেখান।"

ইবনে আব্বাস(রা.) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে, যে কুরআনের অনুসরণ করে, সে দুনিয়ায় পথভ্রষ্ট হবে না এবং আখিরাতেও কষ্ট পাবে না।"

এরপর তিনি তার কথার সমর্থনে তিলাওয়াত করলেন,

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى

"যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না ও কষ্টে পতিত হবে না।"

আর আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"হে মানুষ, তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে তার আরোগ্য) (ওষুধ) এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।"

ইমাম ইবনুল কায়্যিম(রহি.) বলেছেন, "আত্মিক, শারীরিক, দুনিয়াবি ও পরকালীন যাবতীয় রোগের জন্য কুরআন হচ্ছে পরিপূর্ণ শিফা (আরোগ্য দানকারী ওষুধ)।"

আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ

"যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তাদের মধ্যে যারা যথাযথভাবে তা তিলাওয়াত করে তারাই এতে বিশ্বাস করে।"

যথাযথভাবে তিলাওয়াত করা মানে হচ্ছে, আপনি তা তিলাওয়াত করবেন, হিফয করবেন, তা বুঝবেন, তা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা বা তাদাব্বর করবেন এবং তদনুযায়ী আমল করবেন। যেমনটা করে সাহাবা ও তাবিঈগণ আমাদের সামনে নজির স্থাপন করে গিয়েছেন।

ইবনে মাসউদ(রা.) বলেছেন, "আমাদের মাঝে কোনো ব্যক্তি দশ আয়াত শেখার পর তার অর্থ ও তা দ্বারা করণীয় আমল না শিখে সামনে এগোত না।"

কুরআনের অর্থ না বুঝে তিলাওয়াত করলে এবং তাতে যে বিধান এসেছে তার ওপর আমল না করলে তিলাওয়াতের হক আদায় হয় না। এ জন্যই ফুদাইল বিন আয়াদ (রহি.) বলেছেন, "কুরআন তো তা দ্বারা আমল করার জন্য নাযিল হয়েছিল। কিন্তু লোকেরা তার তিলাওয়াতকেই একমাত্র আমল হিসেবে ধরে নিয়েছে।"

আল্লাহ যখন বান্দাকে কুরআন তিলাওয়াত, কুরআনের তাদাব্বুর (গভীর চিন্তা-ভাবনা) এবং কুরআনের আমল দ্বারা নফসের মুজাহাদা করার তাওফিক দেবেন তখন তিনি আসলে তাকে আত্মশুদ্ধির এক বিশাল অংশই দান করবেন।

উপসংহার:

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব এত বেশি যে, প্রত্যেক পরিশুদ্ধিকামী মুসলিমের ওপর ওয়াজিব হল সে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে অন্তরের গভীর পরিচর্যা করবে এবং জীবদ্দশায় এই প্রশংসনীয় ও উচ্চমার্গীয় কর্মকে সঠিকভাবে পালন করতে সে মুজাহাদা করবে। এতে করে সে দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য লাভকরবে এবং সেই সাথে প্রকৃত সৌভাগ্য লাভে ধন্য হবে। আত্মশুদ্ধির পথ তো এমন এক পথ, যার শুরু আছে কিন্তু আক্ষরিকভাবে কোনো শেষ নেই। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। আপনি হয়তো বারবার পা পিছলে পড়বেন কিন্তু থেমে যাবেন না, আবার উঠে দাঁড়ান, নতুন করে নতুন উদ্যমে পথ চলুন। নিজের ওপর অত ভরসা রাখার দরকার নেই, ভরসা রাখুন আল্লাহর ওপর, তিনিই সহজ করবেন আপনার পথ চলার কষ্টকে, টেনে নিয়ে যাবেন সাফল্যের দুয়ারে।

প্রত্যেক মুসলিমের ওপরই তার নফসের হক রয়েছে, যেমনটা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

"নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার নফসের হক রয়েছে।"

আল্লাহ নফসকে যেসব হকের মুখাপেক্ষী করে সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে তাকে বঞ্চিত রেখে তার ওপর কঠোরতা আরোপ করাকে যে ব্যক্তি নফসের হক মনে করেছে, সে আসলে ভুল করছে। অনুরূপভাবে সে ব্যক্তিও ভুল করছে যে মনে করেছে নফসকে ছাড় দেওয়া, তাকে পরিচালনা করা বাদ দিয়ে নিজেই তার দ্বারা পরিচালিত হওয়া এবং নফসকে অশ্লীলতা দ্বারা পূর্ণ হওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া বা এমন-সব কাজ করাই বুঝি নফসের হক।এভাবে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা অসম্ভব; বরং আত্মশুদ্ধি তো হবে শরীয়াসম্মত ভারসাম্য রক্ষা ও মধ্যপন্থার মাধ্যমে। না বাড়াবাড়ি করে আর না ছাড়াছাড়ি করে। আর সেই সাথে নবীজী (সা.) এর হিদায়াতের দৃঢ় অনুসরণের মাধ্যমে ও তাঁর দেখানো সঠিক পথে চলে।